বন্ধন

সংকলন ২০২১, সংখ্যা- এগার

Bengali Society for Puja & Culture Inc. (BSPCI) WA, Australia

Pharmacy 777 Nollamara

WE PROVIDE ***personalised care*** TO CREATE MEANINGFUL OUTCOMES FOR ***your health.*** OUR SERVICES INCLUDE:

- Sleep apnoea screening, management and support
- Diabetes management and NDSS supplies
- Blood pressure checks
- Asthma management
- Pain management
- Weight management
- Mental health support
- Private pharmacist consultations
- Medication reviews
- Parent's Group
- Scripts Online and reminders for your prescriptions
- Free every day Express Delivery in the local area
- Mobility and home aids for hire
- Medical certificates
- Compounding
- Medication packing (DAA)
- Disposal of expired medications
- Flu vaccinations

EVERY DAY 8AM - 10PM
Nollamara Shopping Centre,
84 Hillsborough Drv
Call 08 9349 1570
Email nollamara@pharmacy777.com.au

HERE FOR YOUR *health*, FOR *life*.

GUILD NATIONAL PHARMACY OF THE YEAR 2016

www.pharmacy777.com.au

Ausbangla Enterprise

OPEN 7 DAYS
9:30am - 8:00pm
Thursday
9:30am - 8:30pm

AUSBANGLA ENTERPRISE
(INDIAN GOURMET CANNINGTON)

Cannington Butchers
Fresh Fruits & Vegetables

Shop 4/ 1468 Albany Hwy
CANNINGTON - 9356 3746
ausbanglaenterprise@yahoo.com.au
ausbanglaenterprise.com.au

বন্ধন

BANDHAN

সংকলন ২০২১, সংখ্যা- এগার

Magazine 2021, Issue 11
আশ্বিন ১৪২৮,
October 2021

বন্ধন পরিষদ

প্রসেনজিৎ দাশ
শর্মিষ্ঠাসাহা
বিশ্বজিৎবসু

Bandhan Committee

Prosenjit Das
SharmisthaSaha
Biswojit Bose

প্রচ্ছদ

পঙ্কজ কান্তী দাশ

Cover Design
Pankaj Kanti Dash

Page Makeup
Prosenjit Das
Biswojit Bose

Acknowledgement

Gautam Sharma
Saumitra Seal
Uttam Dewanjee
Dipok Chandra Sarker
Provat Roy

প্রকাশক:
বাঙালি সোসাইটি ফর পূজা এন্ড কালচার,অস্ট্রেলিয়া।

Publisher:
The Bangali Society for Puja and Culture (BSPC) Inc. WA, Australia.

বিঃদ্রঃ লেখকের মতামতের জন্য সম্পাদক বা প্রকাশক দায়ী নয়।

::সম্পাদকীয় ::

"যা দেবী সর্বভুতেষু শক্তিরুপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তশৈ নমো নমঃ ।।
যা দেবী সর্বভুতেষু মাতৃরুপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।"

You hear "East close", "west open", "throw in south facing" and you may just think you're buying a house. During the coronavirus pandemic, that's what the buzz around Durga Puja sounds like around the globe in last couple of years. The issue has gone beyond the 'will it happen, won't it happen' stage and reached the 'it will definitely happen' stage in Western Australia as you all are doing your part to Keep the state safe.

Dear Friends, Welcome to the 2021 issue of Bandhon Magazine, brought to you by the Bengali Society for Puja & Culture Inc (BSPCI), of Western Australia , on the occasion of the celebration of the 2021 Durga Puja. Production of this magazine began several

Months before Puja and is the result of contributions from many people. Within the magazine, you will find literary and artistic works by talented people of various ages. It's good to see that senior members of BSPC continue to contribute and that parents encourage their children to participate and share their works with us.

I am sure this will work as a bridge to bring all the generations together and make our new generation familiar with culture and tradition.

I would like to give special thanks to Pankaj Kanti Dash for designing this year's Bandhan cover page. I would also like to thank the publication committee, Biswojit Bose and SharmisthabSaha, for proof-reading, checking, and giving me suggestions for the magazine. Last but not least, Uttam Dewanjee for his fund-raising efforts through sponsors.

I hope you enjoy reading the magazine and will consider contributing something of your own for next year's publication. I wish you all a Happy Durga Puja 2021!

- Prosenjit Das

Bangali Society for Puja and Culture Inc. (BSPCI), WA
Executive Committee 2020-2021

President	**:** Dipok Chandra Sarker
Vice-President	**:** Biplob Paul
General Secretary	**:** Uttam Dewanjee
Assist General Secretary	**:** Jisu Sen Gupta
Treasurer	**:** Debashis Saha
Publication Secretary	**:** Prosenjit Das
Cultural Secretary	**:** Nandita Roy
Assist. Cultural Secretary	**:** Ipsito Barnik Arko
Religious Secretary	**:** Anu Sharma
Assistant Religious Secretary	**:** Sithi Chakraborty
Advisory Members	**:** Jahar Chowdhury
	: Saumitra Seal
	: Tanmoy Debnath
	: Subarna Chowdhury

সূচীপত্র

১. কৃষ্ণ চরিত্রে রাধা -পুরাণ ও ইতিহাসের আলোকে - নান্টু রায়
২. আমার আমি এবং আকবর স্যার -বিশ্বজিৎ বসু
৩. পুজোর গান - তপন বাগচী
৪. সভ্যতার হাসি- খলিলুর রহমান
৫. যাবার সময় মনের চাওয়া- খলিলুর রহমান
৬. কল্পলোকের পঙক্তিমালা- দীপজন মিত্র
৭. লাল মায়ার কাব্য - মলি সিদ্দিকা
৮. কাশফুলের খোঁজে - অনুরাধা মুখোপ্যাধ্যায়
৯. প্রথম ইউরোপ ভ্রমণ শুভংকর বিশ্বাস
১০. Compassion knows no boundaries --Rita Afsar PhD
১১. গাধাদের গল্প -কমলেশ রায়
১২. নাটিকা: করোনা শর্মিষ্ঠা সাহা
১৩. What You Call a Nightmare…- Shayan Dash
১৪. Platypus vs Echidna- Dibbo Barua
১৫. Reincarnation of Durga- Audri Paul
১৬. The story of a poor girl- Bela Paul
১৭. The Electrician- Prithul Bisshay
১৮. Caterpillar Cam the Superhero-Starting Out - Irfan Galib
১৯. Getting Older- Joyoti Sarker
২০. Mummy Disaster-Rayan Dash
২১. My Zoo Expedition-Sreyoshi Sen
২২. How Durga Saved the Gods from Mahishasu -By Rajshree
২৩. বৈপরীত্যে-স্বর্ণা আফসার
২৪. অতি-পাণ্ডিত্যের দৌরাত্ম্য প্রমাণিত - আজিজ ইসলাম
২৫. ঝালমুড়ি, প্রেমিকযুগল, ভাঙাসিঁড়ি ও আমি- অনুরাধা মুখোপ্যাধ্যায়

কৃষ্ণ চরিত্রে রাধা

পুরাণ ও ইতিহাসের আলোকে

- নান্টু রায়

সম্প্রতি এক বন্ধু ফেসবুকে কোনও এক একাদশীর পারণের বিবিধ চর্ব-চষ্য-লেহ্য-পেয়-র ছবি সংবলিত পোস্ট দিয়ে লিখলেন, ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীতচৌরং/ গোপাঙ্গনা নাং চ দুকূলচৌরং।// অনেক জন্মার্জিত পাপচৌরং/ চৌরাগ্র্যগণ্যং পুরুষং নমামি ॥

আমি পাঠমাত্র প্রতিক্রিয়া জানালাম, এই শ্লোকটির রচয়িতা কে, এর মানে কী? বন্ধুর ত্বরিত জবাব, এটি বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কৃষ্ণপ্রণাম মন্ত্র, যার মানে হচ্ছে, `যিনি ব্রজে নবনীত চোর ও গোপাঙ্গনাদের বসন চোর বলে প্রসিদ্ধ ও যিনি স্বীয় ভক্তদের অশেষ জন্মার্জিত পাপসকল হরণ করেন, সেই চোর শিরোমণিকে প্রণাম করি।, আমি বললাম, এ তো খুব সুন্দর কৃষ্ণপ্রণাম মন্ত্র! বাবাকে প্রণাম করে আপনি বললেন, `বাবা তুমি শুয়োরের বাচ্চা, বাবা তুমি কুত্তার বাচ্চা, কিন্তু যেহেতু তুমি আমার জন্মদাতা, তাই তোমাকে প্রণাম করি।, বন্ধুটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, `আমরা কৃষ্ণকে ভালবেসে এমনই বলি। এ আমাদের ভালবাসার প্রকাশ।, আর কথা চলে না। কৃষ্ণকে তারা ভালবেসে চোর বলছেন, চোরশিরোমণি বলছেন-- নবনীত চোর, গোপাঙ্গনাদের কূলচোর, বসনচোর, ভক্তদের পাপরাশি চোর, শেষে সেই চোর-অগ্রগণ্য পুরুষকে তারা প্রণাম করছেন। যাঁকে `কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং, বলে স্বীকার করছি, সেই ভগবানকে চোর বলছি, চোরশিরোমণি বলছি। ভাবুন, কী ধৃষ্টতা! এতে যে আমাদের পাপ হচ্ছে, ক্রমাগত পাপ রাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে-- এ বোধটুকুও নেই। ভগবৎচরিত্রের এমন কল্পনায় ভারতবর্ষের পাপ রাতে বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরাণ-ইতিহাস আলোচনা করে দেখেছি, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যে-সব পাপ-উপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত-- সবই অমূলক কুনাট্য ছাড়া কিছু নয়। এসব বাদ দিলে বাকি যা থাকে, তা অতি বিশুদ্ধ, পরম পবিত্র, অতিশয় মহৎ। তাঁর মত সর্বগুণান্বিত, সর্বপাপসংস্পর্শশূন্য আদর্শ চরিত্র আর কোথাও নেই। কোনও দেশীয় ইতিহাসে না, কোনও দেশীয় কাব্যেও না।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, `কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং-- এই যদি বাঙালির বিশ্বাস, তবে সব সময়ে কৃষ্ণ আরাধনা, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা ধর্মেরই উন্নতিসাধক। সকল সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করার চেয়ে মানুষের মঙ্গল আর কী আছে? কিন্তু এঁরা ভগবানকে কী রকম ভাবেন? ভাবেন, ইনি বাল্যে চোর-- ননী-মাখন চুরি করে খেতেন; কৈশোরে পারদারিক-- অসংখ্য পতিব্রতার ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট করেছেন; পরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ-- বঞ্চনা করে দ্রোণ প্রভৃতির প্রাণহরণ করেছিলেন! ভগবৎচরিত কি এমন? যিনি শুদ্ধসত্ত্ব, যাঁর থেকে সব ধরনের শুদ্ধি, যাঁর নামে অশুদ্ধি ও পাপ দূর হয়, মানবদেহ ধারণ করে এসমস্ত পাপাচরণ কি সেই ভগবৎচরিত্রে শোভা পায়?

জগোপী ও শ্রীরাধা

ননীচুরির ব্যাপারটা লঘু করে দেখা যেতে পারে, শিশু-বালকের কাজ। কিন্তু বসনচুরি, তাদের চরিত্রহরণ তো গুরুতর অপরাধ। এটা কী কৃষ্ণ করতে পারেন? দেখা যাক, পুরাণেতিহাসে কী আছে? কৃষ্ণবিদ্বেষীরা কৃষ্ণচরিত্রে কলঙ্ক আরোপের জন্য ব্রজগোপীতত্ত্ব ফেনায়িত করেছেন, কিন্তু মহাভারতে ব্রজগোপীদের কথা কিছুই নেই। সভাপর্বে শিশুপালবধ পর্বাধ্যায়ে শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দার সবিস্তার বর্ণনার কোথাও ব্রজগোপীঘটিত কৃষ্ণের কলংকের কথা উচ্চারিত হয়নি। যদি এ কলংক থাকত, তাহলে শিশুপাল কিংবা শিশুপালবধবৃত্তান্ত প্রণয়নকারী কবি কখনওই কৃষ্ণনিন্দাকালে হাতছাড়া করতেন না। শুধু সভাপর্বে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে সকাতরে ডাকার সময় একবার `গোপীজনপ্রিয়, শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

সুন্দর শিশুর প্রতি স্ত্রীজনসুলভ স্নেহ থাকাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিষ্ণুপুরাণে বিষয়টি পবিত্রভাবে উত্থাপিত হয়েছে। হরিবংশে কিছু বিলাসিতা দেখা যায়, ভাগবতে আদিরসের বিস্তার শুরু হয়েছে আর ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আদিরসের রাতে বয়ে গেছে। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশের ত্রয়োদশ অধ্যায় ছাড়া ব্রজগোপীদের কথা আর কোথাও নেই। সেখানে রাসলীলার উল্লেখ আছে। রাস হল নারী-পুরুষে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চক্রাকার ঘুরতে ঘুরতে নাচ-গান করা। বালক-বালিকারা এরকম নাচ-গান করে থাকে। সদ্যকিশোর কৃষ্ণও গোপ বালক-বালিকাদের সঙ্গে এমন নাচ-গান করেছেন। সদা ক্রীড়াশীল বালকের এমন প্রমোদে আদিরস থাকতে পারে না। কেবল কৃষ্ণের মথুরা গমনকালে তাঁদের খেদোক্তি আছে। হরিবংশেও ব্রজগোপীদের কথা বিষ্ণুপর্বের ৭৭ অধ্যায় (গ্রন্থান্তরে ৭৬ অধ্যায়) ছাড়া আর কোথাও নেই। তবে হরিবংশে `রাস, শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি, তার পরিবর্তে `হল্লীষ, শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই অধ্যায়ের নাম `হল্লীষক্রীড়নম্,।`হল্লীষ, এবং `রাস, একই কথা-- নৃত্যবিশেষ। কবিত্বে, গাম্ভীর্যে, পান্ডিত্যে ও ঔদার্যে হরিবংশকার বিষ্ণুপুরাণকারের তুলনায় অনেক লঘু। তিনি বিষ্ণুপুরাণকারের রাসবর্ণনার নিগূঢ় তাৎপর্য ও গোপীদের ভক্তিযোগে কৃষ্ণে একাত্ম হয়ে যাওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারেননি। তাই বিষ্ণুপুরাণের চপলা বালিকা আনন্দে চঞ্চলা, হরিবংশে সেই গোপীরা বিলাসিনীর ভাব প্রকাশ করছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজগোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ শুধু রাসলীলায় সীমাবদ্ধ নেই। ভাগবতকার গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলার বিশেষ বিস্তার ঘটিয়েছেন। সময়ে সময়ে তা আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ। কিন্তু এসব বর্ণনার বহিরঙ্গ রুচিবিরুদ্ধ মনে হলেও অন্তরঙ্গে অতি পবিত্র ভক্তিতত্ত্ব নিহিত রয়েছে। হরিবংশকারের মত ভাগবতকার বিলাসপ্রিয়তা-দোষে দূষিত নন। তাঁর অভিপ্রায় অতি নিগূঢ় ও বিশুদ্ধ। ভাগবতের দশম স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে প্রথমত গোপীদের পূর্বরাগ বর্ণিত হয়েছে। তারা কৃষ্ণের বাঁশি শুনে মোহিত হয়ে পরস্পরের কাছে কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ ব্যক্ত

করছেন। সেই পূর্বানুরাগ বর্ণনায় কবি অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশ করেছেন। আর সেটা ব্যাখ্যা করতে তিনি `বস্ত্রহরণ, পালা ফেঁদেছেন, যার সারমর্ম হচ্ছে ভগবানকে পেতে সর্বস্ব ত্যাগ করা যায়, লজ্জা যে নারীর ভূষণ, তাও ত্যাগ করা যায়। বস্ত্রহরণের কোনও কথা মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ বা হরিবংশে নেই, এটি ভাগবতকারের একান্ত কল্পনাপ্রসূত।

অথর্ববেদের উপনিষদসমূহের মধ্যে গোপালতাপনী নামে অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদে কৃষ্ণকে গোপগোপীপরিবৃত দেখা যায়। কিন্তু এতে গোপগোপীর অর্থ প্রচলিত অর্থের থেকে আলাদা। এখানে গোপী অর্থে অবিদ্যা কলা। আর গোপীজনবল্লভ অর্থে `গোপীনাং পালনশক্তীনাং জনঃ সমূহঃ তদ্বাচ্যা অবিদ্যাঃ কলাশ্চ তাসাং বল্লভঃ স্বামী প্রেরক ঈশ্বরঃ।, উপনিষদে গোপীর এমন অর্থ আছে, অথচ রাসলীলার কোনও কথাই নেই। রাধার নামমাত্র নেই। একজন প্রধানা গোপীর কথা আছে, তিনি রাধা নন, তাঁর নাম গান্ধর্বী। তাঁর প্রাধান্যও কামকেলিতে নয়, তত্ত্বজিজ্ঞাসায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ আর জয়দেবের কাব্য ছাড়া কোনও প্রাচীন গ্রন্থে রাধা নেই।

ভাগবতের দশম স্কন্ধের ২৯-৩৩ এই পাঁচ অধ্যায়ের নাম রাসপঞ্চাধ্যায়। কৃষ্ণের বাঁশি শুনে গোপাঙ্গনাদের কৃষ্ণদর্শনে ধাবিত হতে এবং কৃষ্ণের সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত দেখা যায়। কিন্তু সেখানে `রাধা, নাম কোথাও পাওয়া যায় না। রাধা নাম বৈষ্ণবাচার্যদের অস্থিমজ্জায় ঢুকে আছে। তাঁরা টিকাটিপ্পনীর ভিতর বারবার রাধা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, কিন্তু মূলে কোথাও রাধার নাম নেই। গোপীদের অনুরাগপ্রাবল্যজনিত ঈর্ষার প্রমাণস্বরূপ কবি লিখেছেন যে, তারা পদচিহ্ন দেখে অনুমান করেছিল যে, কোনও একজন গোপীকে নিয়ে কৃষ্ণ বিজনে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু তাও গোপীদের ঈর্ষাজনিত ভুলমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হলেন, এ কথাই আছে, কাউকে নিয়ে অন্তর্হিত হলেন, এমন কথা নেই এবং রাধার নামগন্ধও নেই।

রাসপঞ্চাধ্যায় কেন, সমস্ত ভাগবতে কোথাও রাধার নাম নেই। ভাগবত কেন, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ বা মহাভারতে কোথাও রাধার নাম নেই। অথচ এখন কৃষ্ণ উপাসনার প্রধান অঙ্গ রাধা। রাধা ছাড়া এখন কৃষ্ণনাম নেই। রাধা ছাড়া বাংলায় কৃষ্ণের মন্দির নেই, মূর্তি নেই। বৈষ্ণবদের অনেক রচনায় কৃষ্ণের চেয়েও রাধা প্রাধান্য লাভ করেছেন। যে রাধাকে নিয়ে ভারতবর্ষ বিশেষত বাঙলা মাতোয়ারা, সেই রাধার উল্লেখ মহাভারতে নেই-- বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, এমনকি ভাগবতেও নেই। তাহলে এ রাধা এলেন কোথা থেকে?

রাধাকে প্রথম দেখতে পাই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে। আদিম ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বিলুপ্ত, এখন যেটা পাওয়া যায়, তা পুরাণসমূহের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বলে বোধহয়। এর রচনাপ্রণালী এখনকার ভট্টাচার্যদের রচনার মত। এতে ষষ্ঠী মনসার কথাও আছে। এখনকার ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এক নতুন দেবতত্ত্ব হাজির করা হয়েছে। আমরা চিরকাল জানি, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার। অথচ এখানে বলা হচ্ছে, কৃষ্ণই বিষ্ণুকে সৃষ্টি করেছেন। বিষ্ণু থাকেন বৈকুণ্ঠে, কৃষ্ণ থাকেন গোলোকে রাসমন্ডলে-- বৈকুণ্ঠ তার অনেক নীচে। ইনি কেবল বিষ্ণুকে নন, ব্রহ্মা, রুদ্র, লক্ষ্মী, দুর্গা প্রভৃতি সমস্ত দেবদেবী, দানব ও জীবের সৃষ্টি করেছেন। গোলকধামে গো, গোপ ও গোপিনীরা বাস করে। তারা দেবদেবীর উপর। সেই গোলকধামের অধিষ্ঠাত্রী কৃষ্ণবিলাসিনী দেবীই রাধা। রাধার আগে রাসমন্ডল, রাসমন্ডলে ইনি রাধাকে সৃষ্টি করেন। গোপীদের বাসস্থান গোলোকধাম বৃন্দাবনের অবিকল নকল। এখানে কৃষ্ণযাত্রার চন্দ্রাবলীর মত রাধার প্রতিযোগিনী গোপীর নাম বিরজা। মানভঞ্জন যাত্রায় যেমন যাত্রাওয়ালারা কৃষ্ণকে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নিয়ে যায়, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকারও তেমনি কৃষ্ণকে গোলোকধামে বিরজার কুঞ্জে নিয়ে গেছেন। তাতে যাত্রার রাধিকার মনে যেমন ঈর্ষা ও কোপের সৃষ্টি হয়, ব্রহ্মবৈবর্তের রাধিকার মনেও তেমনি ঈর্ষা ও কোপের সৃষ্টি হয়েছিল। তাতে আরেক মহা গোলযোগ ঘটে যায়। রাধিকা কৃষ্ণকে হাতেনাতে ধরার জন্যে রথে চড়ে বিরজার মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে বিরজার দ্বার রক্ষা করছিলেন শ্রীদামা বা শ্রীদাম। শ্রীদাম রাধিকাকে দ্বার ছাড়ে না। এদিকে রাধিকার ভয়ে বিরজা গলে জল হয়ে নদীতে রূপান্তরিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাতে দুঃখিত হয়ে তাঁকে পুনর্জীবন ও পূর্বরূপ প্রদান করলেন। বিরজা গোলোকনাথের সঙ্গে নিত্য আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন। ক্রমে তার সাতটি পুত্র জন্মাল। কিন্তু পুত্ররা আনন্দ অনুভবের বিঘ্ন ঘটায়, তাই মা তাদের অভিশাপ দিলেন, তারা সাত সমুদ্র হয়ে রইল। এদিকে রাধা কৃষ্ণবিরজা-বৃত্তান্ত জানতে পেরে কৃষ্ণকে যারপরনাই ভর্ৎসনা করলেন, এবং অভিশাপ দিলেন যে, তুমি পৃথিবীতে গিয়ে বাস কর। অপরদিকে কৃষ্ণসখা শ্রীদাম রাধার এহেন দুর্ব্যবহারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন। শুনে রাধা শ্রীদামকে গালমন্দ করে শাপ দিলেন, তুমি পৃথিবীতে গিয়ে অসুর হয়ে জন্মগ্রহণ কর। শ্রীদামও কম যান না। তিনিও রাধাকে শাপ দিয়ে বললেন, তুমিও পৃথিবীতে গিয়ে রায়ানপত্নী (যাত্রার আয়ান ঘোষ) হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং কলঙ্কিনীরূপে খ্যাত হবে।

অতঃপর দু,জনেই কৃষ্ণের কাছে এসে কেঁদে পড়লেন। কৃষ্ণ শ্রীদামকে বর দিয়ে বললেন যে, তুমি অসুরেশ্বর হয়ে জন্মাবে, কেউ তোমাকে পরাজিত করতে পারবে না। শেষে শঙ্করের শূলের স্পর্শে মুক্ত হবে। রাধাকেও আশ্বাস দিয়ে বললেন, `তুমি যাও; আমিও যাচ্ছি।, শেষে পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন।

এ সব কথা নতুন এবং সব শেষে প্রচারিত হলেও এই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বাঙলার বৈষ্ণবধর্মের ওপর অতিশয় প্রভাব বিস্তার করেছে। জয়দেব প্রভৃতি বাঙালি বৈষ্ণবকবি, বাঙলার জাতীয় সংগীত, বাঙলার যাত্রা মহোৎসবাদির মূল ব্রহ্মবৈবর্তে। তবে ব্রহ্মবৈবর্তকারকথিত একটা বড় মূল কথা বাঙলার বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করেননি, অন্তত সেটা বাঙালির বৈষ্ণবধর্মে তেমনভাবে পরিস্ফুট হয়নি-- রাধিকা রায়ানপত্নী বলে পরিচিতা, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তের মতে তিনি কৃষ্ণের

বিধিসম্মত বিবাহিতা পত্নী ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখন্ডের ১৫ অধ্যায়ে বিবৃত সেই বিবাহবৃত্তান্ত জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে উদ্ধৃত করছি: `একদা কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে নন্দ বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। সেখানকার ভা-ীরবনে গোরু চরানোর সময় সরোবরের স্বাদু জল তিনি গোরুদের পান করালেন, নিজেও পান করলেন। এবং বালককে বুকে নিয়ে বটমূলে বসলেন। হে মুনে! তারপর মায়াতে শিশুশরীরধারণকারী কৃষ্ণ অকস্মাৎ মায়ার দ্বারা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করলেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং কাননান্তর শ্যামল; ঝঞ্ঝাবাত, মেঘশব্দ, দারুণ বজ্রশব্দ, অতিস্থূল বৃষ্টিধারা এবং বৃক্ষসকল আন্দোলিত হয়ে ভেঙে পড়তে লাগল, দেখে নন্দ ভয় পেলেন। `বাছুরগুলোকে ছেড়ে কিভাবেই-বা নিজের আশ্রয়ে যাই, যদি গৃহে না যাই, তবে এই বালকেরই-বা কি হবে,, নন্দ এমন বলছেন, শ্রীহরি তখন কাঁদতে কাঁদতে মায়াভয়ে ভীত হয়ে বাপের গলা জড়িয়ে ধরলেন। এমন সময় রাধা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।,

রাধার অপূর্ব লাবণ্য দেখে নন্দ বিস্মিত হলেন, তিনি রাধাকে বললেন, `আমি গর্গমুখে জেনেছি, তুমি পদ্মারও অধিক হরির প্রিয়া; আর ইনি পরম নির্গুণ অচ্যুত মহাবিষ্ণু; তথাপি আমি মানব, বিষ্ণুমায়ায় মোহিত আছি। হে ভদ্রে! তোমার প্রাণনাথকে গ্রহণ কর; যেখানে খুশি যাও। পরে মনোরথ পূরণ করে আমার পুত্র আমাকে দিও।

এই বলে নন্দ কৃষ্ণকে রাধার হাতে সমর্পণ করলেন। রাধাও কৃষ্ণকে কোলে করে নিয়ে গেলেন। দূরে গেলে রাধা রাসমন্ডল স্মরণ করলেন, তখন মনোহর বিহারভূমি সৃষ্টি হল। কৃষ্ণকে সেখানে নেওয়া হলে তিনি কিশোরমূর্তি ধারণ করে রাধাকে বললেন, `যদি গোলকের কথা স্মরণ হয়, তবে যা স্বীকার করেছি, তা পূর্ণ করব।, তাঁরা এমন প্রেমালাপে লিপ্ত ছিলেন, এমন সময় সেখানে ব্রহ্মা এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রাধাকে অনেক স্তবস্তুতি করলেন। শেষে নিজে কন্যাকর্তা হয়ে যথাবিহিত বেদবিধি অনুসারে রাধিকাকে কৃষ্ণে সম্প্রদান করলেন। তাঁদের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে তিনি অন্তর্হিত হলেন। রায়াণের সঙ্গে রাধিকার যথাশাস্ত্র বিয়ে হয়েছিল কিনা, যদি হয়ে থাকে, তবে তা আগে না পরে, তা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পেলাম না। রাধাকৃষ্ণের বিয়ের পর বিহারবর্ণন। বলা বাহুল্য যে, ব্রহ্মবৈবর্তের রাসলীলাও অনুরূপ।

পাঠক দেখবেন যে, ব্রহ্মবৈবর্তকার সম্পূর্ণ নতুন বৈষ্ণবধর্ম সৃষ্টি করেছেন। সে বৈষ্ণবধর্মের নামগন্ধ বিষ্ণু বা ভাগবত বা অন্য পুরাণে নেই। রাধাই এই বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ। কবি জয়দেব গীতগোবিন্দ কাব্যে এই নতুন বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করেই গোবিন্দগীতি রচনা করেছেন। এই ধর্ম অবলম্বন করেই শ্রীচৈতন্য কান্তরসাশ্রিত অভিনব ভক্তিবাদ প্রচার করেছেন।

------o------

আমার আমি এবং আকবর স্যার

-বিশ্বজিৎ বসু

একজন মানুষের আমি হয়ে ওঠার পিছনে যেটুকু অবদান তার সবটুকুই এই প্রকৃতি আর পরিবেশের। এই আকাশ, বাতাস, মাটি, জল, বায়ু, গাছ, পাহাড়, নদি, খাল, বিল, পশু, পাখি, মানুষ সবই এক একজন এই আমির শিক্ষাগুরু। এরকম শত শিক্ষাগুরুর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ শিক্ষাই একজন মানুষকে আমি হয়ে উঠতে সাহায্য করে। আর এই উপলব্ধী হতেই হয়তো কবি সুনির্মল বসু লিখেছেন" বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র"।

এই শত শিক্ষাগুরুদের মধ্যে অবশ্যই মানুষের অবদান সবচেয়ে বেশী এবং এই মানুষকুলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অবদান শিক্ষকদের। একারণেই শিক্ষকরা সমাজে মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে স্বীকৃত। সেই হাতে খড়ি কিম্বা তার আগের থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি পর্যন্ত রয়েছে শিক্ষকদের একটি লম্বা ক্রম। ক্রমের তালিকাভুক্ত সমস্ত শিক্ষকদের সম্মিলিত শ্রমের পরিমাণের একত্রিত করলে বোঝা যায় তাঁদের ভূমিকা কত ব্যাপক এবং অপরিসীম। তখন এই শ্রমের তুলনায় আমার আমিকে মনে হয় খুব ক্ষুদ্র।

সমাজ মা বাবার পরেই অবস্থান দিয়েছে শিক্ষকের। সমবেত এত শিক্ষকদের মধ্য আবার কেউ কেউ থাকেন একটু বেশী স্মরণীয় হয়ে। আমার এরকম একজন শিক্ষক-আকবর স্যার।

আকবর স্যারের নাম আকবর মৃধা বলেই জেনেছি। তিনি আমার প্রথম শিক্ষক না হলেও প্রথম স্মরণীয় শিক্ষক। যাকে মনে পরে প্রতিনিয়ত। আনুভব করি সত্তায়। অন্যের ক্ষতি না করার যে চেতনা, সেটি আমার সত্তায় তিনি সুচারু রূপে রোপন করে দিয়েছিলেন সেই বাল্যকালে। যা অনুভব করি প্রতি পদক্ষেপে। অল্প বয়সে স্যারকে অনুভব করতাম ফসলের মাঠে ক্ষেতের আইল দিয়ে হাঁটার সময় কিম্বা কোন বাগানে গাছে ফোটা গোলাপের দিকে তাকিয়ে। আর এখন অনুভব করি সত্তায়।

আমার প্রথম পাঠ আমার মায়ের কাছে। সরস্বতী পুজোয় আমার হাতে খড়ি দিয়েছিলেন পঞ্চানন চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন আমাদের পুরোহিত। আমি তাঁকে দাদু বলে ডাকতাম। আমার প্রথম গৃহশিক্ষক ছিলেন শ্যামল চক্রবর্তি। তাকে ডাকতাম কাকা। দাদুর হাতেখড়ি দেবার কথা মনে নেই কিন্তু শ্যামল কাকার কাছে লাল মলাটের আদর্শ লিপি নিয়ে খেজুরের পাটিতে বসে পড়ার কথা মনে আছ। আমার প্রথম স্কুল আমাদের গ্রামের কৃষ্ণনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এখানেই শুরু হয় আমার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। আমরা বলতাম ছোট ওয়ান। বেড়াবিহীন একটি ভাঙাচোড়া ঘরে বসতো আমাদের সেই ছোট ওয়ানের ক্লাস। কে ক্লাস নিতেন কিছুই মনে করতে পারি না। শুধু মনে পরে ছুটির ঠিক আগে স্কুলের পাশে একটি ঝাকড়া আম গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে সমবেত স্বরে নামতা পড়তাম। একজন ছাত্র গাছের শিকড়ের উপর দাড়িয়ে পড়াত এক অক্কে এক, দুই

অঙ্কে দুই।আমরা নিচে দাঁড়িয়ে সমবেতভাবে সুরে সুরে পড়তাম এক অঙ্কে এক, দুই অঙ্কে দুই। তারপর আমাদের ছুটি হয়ে যেত।

এর পরের বছর চলে যাই মামা বাড়ী। ভর্তি হই বালিয়াকান্দি থানার জামালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বাড়ী থেকে মামা বাড়ীতে আসার প্রধান উদ্যোগতা ছিলেন মামা।

মামা তখন হাই স্কুলের ছাত্র। মাসি এ স্কুলের ক্লাস ফাইভের ছাত্র। মাসি আমাকে নিয়ে স্কুলে ভর্তি করে দিল। ভর্তি ফি ছিল এক টাকা। পাকা ভবনের অফিস রুমে টাকা জমা দিয়ে চলে গেলাম ক্লাসে। সেখানে জায়গা পেলাম প্রথম বেঞ্চে।

টিনের ঘরে মাটির মেঝে। গিজ গিজ করছে ছাত্র। দ্বিতীয় দিন স্কুলে গিয়ে দেখি যেখানে গতকাল বসেছিলাম সেখানে অন্য একজন বই রেখে দিয়েছে। আমার জায়গাতে অন্যের বই! আমার সহ্য হলো না। আমি তার বই সরিয়ে রেখে সেখানে আমার বই রেখে বসে পরলাম। কিছুক্ষণ পর সেই ছাত্র এসে হুঙ্কার, আমার বই সরাইছিস ক্যা। শুরু হলো জায়গা দখলের ধাক্কাধাক্কী। বই রেখে মাসিকে ডেকে আনলাম। কিন্তু মাসির বিচারে আমি হেরে গেলাম। যে আগে এসেছে এ জায়গা তার।

কদিন জামালপুর স্কুলে পড়েছিলাম মনে করতে পারি না। এরপর আমাকে পাঠানো হলো নবগঠিত নওপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। দিনটিতে শুরু হলো স্কুলে আনুষ্ঠানিক যাত্রা। লাউজানা গ্রামে হালটের তেমাথায় পাশাপশি কয়েকটি বাড়ির কাছারি ঘর, বারান্দা আর পাড়ার মসজিদের বারান্দায় শুরু হলো স্কুল। মসজিদের সামনে খোলা জায়গায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে শুরু হয়েছিল স্কুলের কার্যক্রম। আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে পতাকাকে স্যালুট জানিয়েছিলাম। প্রথম গান গেয়েছিলাম জাতীয় সংগীত -আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।

আমাদের ক্লাস বসলো একটি ছনের ঘরের বারান্দায়। চার পাঁচজন ছাত্র। এদের একজনের নাম ছিল দুলি। মনে পরে লাল রংয়ের একটি জামা পরে ঘরের দরজা দিয়ে বের হয়ে এসে আমাদের সাথে খেজুরের পাটিতে বসে পড়া শুরু করেছিল। পরে জেনেছিলাম ওটা ছিল দুলিদের মামাবাড়ী। কয়েকদিন পর দেখি সেই ছেলেটি যার সংগে জামালপুর স্কুলে ফার্স্ট বেঞ্চে বসা নিয়ে মারামারি করেছিলাম। সে আমার দিকে বড় বড় চোখ করে বলেছিল -তুই এখানে। এদিন জানলাম ওর নাম জয়নাল। পরবর্তীতে জয়নাল আমার প্রিয় বন্ধু হয়ে উঠেছিল।

এ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন আকবর স্যার। গায়ের রং কালো মিচমিচে। কালো মুখে সাদা দাঁতগুলো ছিল মুক্তার মত। কণ্ঠ ছিল ভড়াট। আর চোখ দুটো ছিল দাঁতের চেয়েও উজ্বল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন একজন নারী। তিনি স্কুলে আসতেন মাঝে মাঝে। আকবর স্যারই প্রধান শিক্ষকের দায়ীত্ব পালন করতেন। জয়নাল আকবর স্যারের ছোট ভাই। এর ভিতরে এলো ২৬শে মার্চ। স্বাধীনতা দিবস। লাউজানা সেই মসজিদের সামনে থেকে শুরু হলো স্বাধীনতা দিবসের র‍্যালি। আকবর স্যার আমার হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিয়েছিলেন।

মামা বাড়িতে থাকালীন সময়ে আমি একটু এক্সট্রা ভালবাসা পেতাম। এর পিছনে কারণ ছিল আমার প্রয়াত দাদু। আমার মায়ের বাবা-শান্তি ঘোষ।দাদু আমৃত্যু ছিলেন গাজনা ইউনিয়নের মেম্বার। একবার তিনি তৎকালীন চেয়ারম্যানের সংগে কোন কারণে মতবিরোধ হওয়ায় চেয়ারম্যানকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন "আমি চেয়ারম্যান নির্বাচন করলে তুমি জিততে পারবে না" পরের নির্বাচনে চ্যালেঞ্জ দিয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিজয়ের পর তিনি সিও অফিসে গিয়ে পদত্যাগ পত্র জমা দেন। বলেন আমি আজিমদ্দিকে দেখাতে চেয়েছিলাম আমি চেয়ারম্যান হতে চাইলে হতে পারি কিন্তু আমি চেয়ারম্যানি করতে চাই না। মেম্বারেই সন্তুষ্ট। কিন্তু আইন অনুযায়ী নূন্যতম তিন মাস দায়ীত্ব পালন করে পদত্যাগ করেন। আজিমদ্দী সাহেবকে আবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে এভাবে পদত্যাগ করার ঘটনা খুবই বিরল। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো এর কয়েক বছর পর সেই আজিমদ্দী গংদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে দাদু খুন হয়ে যান। আমার হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দেয়ার পিছনে দাদুর প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা কাজ করেছিল বলে মনে হয়েছিল।

স্যার যখন পতাকাটা আমার হাতে পতাকা তুলে দিয়েছিলেন সে মূহুর্তের আনন্দ আর গর্বের অনুভূতিটুকু এখনও চোখ বুজে অনুভব করি। লম্বা একিট তল্লা বাঁশের মাথায় বড় একটা পতাকা বহন করতে আমার একটু কষ্টই হচ্ছিল। কিছুদুর যাবার পর স্যার আমার হাত থেকে পতাকা নিয়ে তুলে দিলেন আরেক ছাত্রের কাছে।

কিছুদিন পর স্কুলের জায়গা নির্ধারিত হলো। যাওয়া আসার পথে সেই জায়গাটি বড় আপন মনে হতো। স্কুল থেকে কিছুদুরে একটি বাড়ি থেকে পুরানো টিনের ঘর কিনে বানানো হলো স্কুল ঘর। যেদিন সে ঘরখানা ভাঙা হয় সেদিন দেখতে গিয়েছিলাম। ঐ বাড়ির তিনজন তখন স্কুলের ছাত্র। তিনজন সহোদর ভাই বোন। দুজনের নাম মনে পরে, লিলি আর বাবুল। বাবুল ছিল এ স্কুলে আমাদের সহপাঠি।

স্কুল ঘর তৈরির পর মুল ক্যাম্পসে শুরু হলো ক্লাস। নতুন নতুন ছাত্র আসা শুরু হলো। সালেহা, জয়নাল, মঈন, বাশার, দুলি, পল্টু, জোবেদা, চায়না, শেফালী, মতি, লিয়াকত। লিয়াকত ছিল বয়সে অনেক বড়। উচু লম্বা এবং স্বাস্থ্যবান। ওর বড় ভাই ছিল ভ্যাটে। সে আরও বড়, ক্লাস ফাইভে পড়তো। কিন্তু পরিপূর্ণ যুবক।

নতুন স্কুলে যাওয়া যেন অন্য এক আনন্দ। মঈন, চায়না, শেফালি, আমি এক এলাকায় হওয়াতে একসংগে দল বেঁধে হেটে স্কুলে যেতাম। দল বেধে হৈহৈ করে খেতের আইল ধরে, হালটে পথে রেল ক্রিসং পার হয়ে যেতাম স্কুলে।

স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা আর আকবর স্যার ছাড়া আরও দুজন শিক্ষক ছিলেন স্কুলে। এর একজন ছিল আমাদের সহপাঠী সালেহার দুলাভাই। আরেকজন আকবর স্যারের চাচাত ভাই। তাঁদের নাম মনে নেই। স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক হিসাবে মাঝে মাঝে ক্লাস নিতেন মোতালেব নামে একজন। মামা বাড়ীর সাথে পারিবারিক সম্পর্ক থাকায় তাকে মামা বলে ডাকতাম। আকবর স্যারের যে ভাই শিক্ষক ছিলেন কথায় কথায় বেত দিয়ে ছাত্রদের পেটাতেন। তারপর বলতেন তোদের কেন পিটায় জানিস! আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন স্যারের হাতে প্রচুর মার খেতাম, তখন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি কোনদিন টিচার হলে ছাত্রদের পেটাব। তাই তোদের পেটায়। আকবর স্যার কখনও বেত নিয়ে ক্লাসে ঢুকতেন না। শাসনের জন্য মোটা গলা আর চোখের চাহনিই ছিল যতেষ্ট।

ক্লাস ওয়ান থেকে টুতে যখন উঠলাম, আমার রোল হলো তিন। প্রথম সালেহা, দ্বিতীয় জয়নাল, তৃতীয় আমি। আমি প্রাইভেট পড়া শুরু করলাম আকবর স্যারের কাছে। পড়তে যেতাম স্যারের বাড়ি ডাঙ্গাতি মোহন গ্রামে। স্যার যে ঘরে পড়াতেন সে ঘরে আরো ছাত্রদের দুখানা পাশাপাশি খাটের উপর বসতাম। স্যার বসতেন একটি চেয়ারে। পাশে ছিল একটি টেবিল। ঘরের পাশে ছিল বেশ কয়েকটি গোলাপ গাছ। জানালা দিয়ে গোলাপ গাছ দেখ যেত। বলা যায় এটা ছিল আমার প্রথম দেখা বাগানে ফোটা গোলাপ। তখন থেকেই স্বপ্ন দেখতাম একদিন বাগানে গোলাপ গাছ লাগাব।

আমাদের স্কুলে যাওয়া আসার পথে পরতো ফসলি জমি। আষাঢ় মাসে সেখানে আউশ ধানের চাষ হতো। তার মাঝে সাথী ফসল হিসাবে ছিল কাউন। কাউনের ছড়াগুলো দেখতে ঠিক কাঠ বিড়ালীর লেজের মত। মজার ব্যাপার হলো একটি কাউনের ছড়ার সংগে আরেকটা কাউনের ছড়া রাখলে পরস্পর পরস্পর দুটিকে চৌম্বকীয় এক আকর্ষণে জড়িয়ে ধরে। টেনে তাকে আলাদা করতে হয়।

একদিন আমি আর মঈন দুজনে সেই ক্ষেতের পাশ দিয়ে স্কুলে যাবার সময় কয়েকটি করে কাউনের ছড়া ছিড়ে একটার সাথে আরেকটা লাগিয়ে তোড়ার মত বানালাম। তারপর দুজনে দুটি তোড়া নিয়ে উপস্থিত হলাম ক্লাসে। ভেবেছিলাম স্যার আমাদের ফুলের তোড়া দেখে খুশি হবেন। কিন্তু ঘটনা হলো উল্টো। আকবর স্যার ক্লাসে এলেন। তাঁর চোখে পড়ল কাউনের তোড়া। মুহূর্তের মধ্যে স্যারে চোখ লাল হয়ে গলে। কাউকে পাঠালেন বেত আনতে অফিস রুমে। তারপর জেরা, ওটা কার ক্ষেত থেকে এনেছ। বললাম ইসাব মামাদের ক্ষেত থেকে। কেন তুলেছ? কোন উত্তর দিতে পারলাম না। বুঝলাম অন্যায় করে ফেলেছি। স্যার আমাদের দুজনকে হাই বেঞ্চের উপর উঠতে বললেন। তার পর বললেন নিল ডাউন করো। ফ্লোর ছিল মাটির। সেখান থেকে তুলে আনলেন ছোট চারটি টুকরো ইট। দুটি আমার দুই হাটুর নিচে, দুটি মঈনের হাটুর নিচে। কষ্টে আমাদের চোখে জল বেরিয়ে এলো। ইতিমধ্যে বেত চলে এসেছে। বেত হাতে নিয়ে বললেন হাত পাত। ডান হাত এগিয়ে দিলাম। একটি হাতে একটি বেতের বাড়ি, বাম হাত এগিয়ে দিলাম। আরেকটি বাড়ি। দুজনের হাতে বেতের বাড়ি দিয়ে বললেন নামো। আর কোনদিন কারও জমি থেকে ফসল ছিড়বে না। এরপর থেকে এখনও কোন ক্ষেতের পাশ দিয়ে যায় সেদিনের কথা মনে পড়ে। মনে পরে আকবর স্যারকে।

একটি রাজনৈতিক পট পরিবর্তন তৃণমুল পর্যায়েও তার ব্যাপক প্রভাব পড়ে । ১৯৭৫ সালের পরও সেটা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর দাদুর খুনি গংদের আস্ফালন আবার শুরু হয়। আমার মামা দেশ ত্যাগ করে চলে যায় ভারতে। আমি নওপাড়া স্কুলের পড়াশুনার পাঠ চুকিয়ে চলে আসি বাড়িতে। ভর্তি হই কৃষ্ণনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এদিকে নবগঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সরকারীকরণ বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষকরা বিভিন্ন চাকুরি নিয়ে চলে যান। কিছুদিন পর বন্ধ হয়ে যায় নওপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। যার বাড়ীর ঘর ভেঙে এনে স্কুলঘর তৈরি হয়েছিল শুনেছিলাম সে এখানে বাড়ী করেছে।

কলেজে ভর্তি হবার পর আকবর স্যারকে হৃদয়ে অনুভব করতে লাগলাম। খোঁজ নিয়ে জানলাম স্যার রেলে চাকরি নিয়েছেন। শুনেছিলাম স্যারের বাবা ছিলেন রেলের কর্মচারি, পোষ্য কোটায় স্যারের চাকরি হয়েছে রেলে। তখন স্যারেকে কল্পনা করতাম একজন স্টেশন মাস্টার হিসাবে। স্বপ্ন দেখা শুরু করলাম কোন এক স্টেশনে হয়তো স্যারের সংগে দেখা হবে। স্যার আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করবেন। আমার পড়াশুনার খোঁজ খবর নিবেন। আমার অবস্থান জেনে খুশি হবেন। অনেকদির পর জানতে পেরেছিলাম স্যার রেলের খালাসী পদে চাকরি করেন। খবরটা শোনার পর এক ধরণের কষ্টে বুকটা ভাড়ী হয়ে উঠেছিল।

ছুটিতে যখন মামা বাড়ি যেতাম খুব ইচ্ছা করতো স্যারের সংগে একবার দেখা করার। কিন্তু তাকে পেতাম না। কালুখালি ভাটিয়াপাড়া লাইন বন্ধ থাকার কারণে স্যারের পোস্টিং ছিল দুরে কোথায়। নব্বই দশকের শেষের দিকে বা দুই হাজার এক বা দুই সালের দিকে জানতে পারলাম স্যার বাড়িতে। জামালপুর বাজারে একটি চায়ের দোকানে বসেন। বন্ধু কাশেম বললো চল স্যারের সাথে দেখা করবি। কাশেম ছিল আমার এক ক্লাস নিচে, কিন্তু আমাদের ছিল চরম বন্ধুত্ব। কাশেম সাথে করে নিয়ে গেল সেই চায়ের দোকানে। দেখিয়ে দিল আকবর স্যারকে।

স্যারের দিকে তাকিয়ে মনে হলো আমার দেখা স্যারের চোখে মুখের সেই জ্যোতি হারিয়ে গেছে। পরিশ্রমী এক শ্রমিক যার মুখের হাড়গুলো স্পষ্ট। গায়ের কালো রংয়ের উপর আরো কয়েক পর্ত কালো রঙের প্রলেপ পড়েছে। যেন সত্যজিৎ রায়ের হীরক রাজার দেশে সিনেমার হীরক খনির কোন শ্রমিক শ্রমিক জীবন্ত বসে আছে আমার সামনে।

স্যারকে দেখে একটা সালাম দিলাম। -আদাব স্যার! কেমন আছেন।

স্বভাবতই স্যার আমাকে চিনতে পারলেন না। স্যার নামে তাকে কেউ সম্বোধন করবে এটা হয়তো তার কল্পনাতেও ছিল না। যারা বসে ছিল তাদের কেউ একটু জায়গা তৈরি করে আমাকে বসতে বললো। আমি বিনয়ের সাথে বললাম ঠিক আছে। স্যার আমাকে প্রশ্ন করলেন – কে

আপনি। আপনাকেতো চিনলাম না।

স্যার যখন আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করলেন আমি ভীষণ অস্বস্তি অনুভব করেছিলাম। স্যারকে বললাম, আমাকে আপনি বলবেন না। আমি আপনার ছাত্র ছিলাম। নওপাড়া প্রাইমারি স্কুলে। জয়নাল আর আমি একসাথে পড়তাম।

স্যার আর একটি কথাও বললেল না। জানিনা কোন দুঃখ কষ্ট স্যারের বুকে হু হু করে উঠেছিল কিনা। নাকি তিনি আমার বুকের ভীতরের আবেগটা বুঝতে পারলেন না। তিনি উঠে গেলেন। কাজ আছে বলে বেরিয়ে গেলেন। আমার সাথে কোন কথাও বললেন না।

কেউ কেউ বললেন চা খেতে। অপ্রস্তুত আমি চা খেতে পারলাম না। বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। স্যারকে বলতে পারলাম না আপনার সেই শিক্ষা আমার পথ চলার পাথেয় হয়ে আছে।

কিছুদিন বন্ধ থাকার পর স্কুলটি আবার চালু হয়। ২০০৭ সালে মামা বাড়ী বেড়াতে গেছি। গিয়ে শুনি আজ স্কুলের স্পোর্টস চলছে। এ স্কুলে প্রথম জাতীয় পতাকা হাতে নিয়েছি। এই স্কুলে প্রথম স্পোর্টসডে তে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করেছি। এই স্কুলে প্রথম কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছি।খুব যেতে ইচ্ছা করলো। সস্ত্রীক গিয়েছিলাম স্কুলে। সব কিছুই, নতুন জায়গা, নতুন ঘর, নতুন শিক্ষক। গিয়ে দেখি মোতালেব মামা। খেলাধুলা পরিচালনা করছেন। তিনি তখন এই স্কুল কমিটির পরিচালনা কমিটির সদস্য।

কবছর পর ২০১১ সালের দিকে দেশে গিয়ে মধুখালি থেকে ভ্যান রিকসায় উঠেছি। ছিপছিপে গড়ন, মুখে চাপদাড়ী, পঞ্চাশোর্ধ ভ্যান চালককের চোখেমুখে একটি ব্যক্তিত্বের ছাপ। আলাপচাড়িতার এক পর্যায়ে জানতে চাইলাম -আপনার বাড়ী কোন গ্রামে। তিনি জানালেন জামালপুর বলের ফিল্ডের পিছনে। আমি বললাম, ডাঙ্গাতমোন। তিনি আমার ভুল সংশোধন করে দিয়ে বললেন নামটা ডাঙাতি মোহন। ভুল নাম বলাকে তিনি মেনে নিতে পারেন নাই। আমি বললাম ডাঙ্গাতমোন আমার এক স্যার ছিল, নাম আকবর মৃধা। তার ভাই জয়নাল ছিল আমার সহপাঠী। তিনি আবারও সংশোধন করে বললেন-ডাঙ্গাতি মোহন। আমি যখন সঠিক ভাবে উচ্চারণ করে বললাম হ্যাঁ-ডাঙাতি মোহন, তখন তিনি জানালেন আকবর মৃধা মারা গেছেন।

স্যারের সংগে আর কোনদিন দেখা হবে না। ভ্যান চালকের দেয়া স্যারের মৃত্যুর খবর মিথ্যা হলেও আর কোনদিন দেখা হবে কিনা জানিনা। স্যার কোনদিন জানানো না আমার আমি হয়ে ওঠার পিছনে তাঁর অবদান কত বড়।

------o------

পুজোর গান

- তপন বাগচী

মা এলোরে, শঙ্খ বাজাও
বাজাও বাঁশি-ঢোল
থমকে থাকা এই জীবনে
জাগুক করলোল।।

কৈলাস থেকে নাইয়রে মা
এলো বাপের বাড়ি
মায়ের পায়ের ধুলোয় ঘুচুক
কোভিড মহামারি
(আবার) নদীর পাড়ের কাশের বনে
লাগলো হিমের দোল।।

মায়ের নামে নাশ হয়ে যায়
যা কিছু দুর্গতি
মায়ের হাতের ছোঁয়ায় বাড়ে
জীবন চলার গতি
(এবার) দুর্গতিনাশিনীর নামে,
বাজুক হল্লাবোল।

মা এলো তাই সবার মুখে
ফুটলো মুখে হাসি
মায়ের আশিস মাথায় নিয়ে
ধন্য জগদ্বাসী
(এখন) সব ভেদাভেদ ভুলে শুধু
আনন্দ-হিল্লোল।।

------o------

সভ্যতার হাসি

- খলিলুর রহমান

ক,পয়সা মুল্য তোর? সোনা কয় লোহারে
আমি থাকি আদরে সভ্য রমণীর চুড়ি ও হাড়ে
আর থাকি জগতের সবচেয়ে সুরক্ষিত ভাণ্ডারে।

লোহা বলে, কর তোর মাথাটাকে ঠাণ্ডা রে
নরম গহনা হয়ে উঠিস যে রমনীর গলা ও হাতে
কেবলই তা ঘটে যে আমারই প্রচণ্ড আঘাতে।
নিতান্তই অক্ষম তুই নিজেরে নিজেই সুরক্ষিতে
তাই রাখে তোরে সবে আমারই চর্ম-ঘরে স্বস্তিতে।

যুগে যুগে আমি আছি পরিশ্রমী মানুষের হাতে
সভ্যতার হাসি ফোটে প্রতিদিন আমারই রুক্ষ আঘাতে।'

------o------

যাবার সময় মনের চাওয়া

- খলিলুর রহমান

যাবার সময় মন বড় চায় আর ক'টা দিন থেকে যেতে
আপনজনের বদনগুলি আর কিছুদিন দেখে যেতে।
সবার সাথে করি নিবিড় কুলাকুলি
এই জগতের সকল রকম হিসেব ভুলি
ইচ্ছা করে পরিচিত নামগুলি ফের ডেকে যেতে।
মন বড় চায় হারানো সেই মাটির ঘরে যাই না ফিরে
যেথায় সময় বয়ে যেত জীবন নিয়ে খুবই ধীরে।
ইচ্ছে করে ছোট্ট হয়ে দাদীর কোলে গল্প শুনি
চিত হয়ে শুই উঠোন 'পরে দূর আকাশের তারা গুনি।
হারিয়ে যাওয়া সেদিনগুলি ফিরে পেয়ে
সবার সাথে কণ্ঠ দিয়ে সে গান গেয়ে
মন বড় চায় আর কিছুদিন মাটির পরশ মেখে যেতে।

নয়নদু'টো বন্ধ হলেই চির আঁধার আসবে নেমে
সবার সাথে বাক বিনিময় আর পরিচয় যাবে থেমে।
একলা হবার সেদিন আসার কদিন আগে
ব্যাকুল আমার মনের মাঝে সাধ যে জাগে
আরও কিছু প্রাণের কথা সবার তরে রেখে যেতে।

------o------

কল্পলোকের পঙক্তিমালা

- দীপজন মিত্র

জানো প্রিয়, হৃদয়ে আমার কীসের জাগে সাধ,
যেভাবেই হোক তোমায় পেতে মন মানে না বাঁধ।
পরের জন্মে হবো আমি কারিগরের সুতা,
অঙ্গে জড়িয়ে থাকবো তোমার হবো তোমার মিতা।
যত্ন করে রাখবে আমায় পরম আদর মমতায়,
তোমার হাতের দখলে র,বো ভালোবাসার ক্ষমতায়।

অথবা হবো জলের কণা মেঘ হয়ে নীল আকাশে,
হলেম বা অবাধ্য, এলোমেলো ঝড়ো বাতাসে।
বৃষ্টি হয়ে ঝরবো জেনো ভিজিয়ে দিতে তোমায়,
দেখবো ক্যামনে দূরে রাখো তখন তুমি আমায়!

হই যদি অস্থির, চঞ্চল নাম-না-জানা পাখি,
আমার সুরে প্রতি ভোরে মেলবে তুমি আঁখি।
উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে দেখবো তোমায় সদা
মুক্ত আমি, আমায় তখন কেউ দেবে না বাঁধা।

না-বুঝ দীপ জানি না, পরজন্ম আছে কি না,
শুধু জানি অস্তিত্বহীন আমি তোমায় বিনা।

------o------

লাল মায়ার কাব্য

- মলি সিদ্দিকা

যে বহ্নিশিখা সতত উজ্জ্বলিত
তার অর্থ কি করে বুঝবে তুমি
তার রূপ, রস, আবেদন কি করে ছোঁবে তোমায়?

তোমার বৈষ্ণবে কি লেখা ছিল
লাল মায়ার কাব্য?
ছিল কি সেথায় কবরীর বেলী ফুল?
এক ঝাঁপি শিউলি-জবা?
সকালের শিশিরে ভেজা
ঘন সবুজ ঘাস?

তুমি কি দেখেছিলে গোধূলি আলোয়
নীল শাড়ীর কাব্য?
বুনো পাহাড়ের শিখরে
নির্জলা এক টুকরো শ্বেত পাথর
বনেদি আংগিনায় বিধবার কির্তন
নীল রাতের কুয়াশায়
অধরা হিমাঙ্গিনী নৃত্য
বাদামী মোমের আলোয়
উষ্ণতার আলিঙ্গন
পেয়েছো কি হে বৈষ্ণব?
রুপোলি রোদে
চিক চিক করা বাদামী এলো চুলে
একরাশি ফাগুনের বন্যা
তাকে বাহারী ফিতেয় বন্দী
দিলেনা একটু মুক্তি
জীবনের অমানিশায় ভীষণ কাতর বেলায়
তৃষ্ণার্ত দু'হাত, বুকের পাঁজর
অপেক্ষার সিঁড়ি বেয়ে অনেক দূর
পেয়েছিলে তাঁর দেখা?

কি ভীষণ তৃষ্ণায় কাতর অপেক্ষা
অপেক্ষার দুয়ারে চৈতন্য এসে কড়া নেড়ে বলে
এবার ক্ষান্ত দাও প্রিয়।।

------o------

কাশফুলের খোঁজে

-অনুরাধা মুখোপ্যাধ্যায়

অতীতের স্মৃতি আর কিছু কথা
আমাকে যেন পাঠালো কে ঠেলে
কাশ ফুলের খোঁজে
অনেক দূরে
মনের রাস্তা ধরে
সামনের কেয়ারী করা লন
হলো গ্রামের মেঠোপথ
আর আমি মনগড়া রাস্তায় ছুটেচলি
নগ্ন পায়ে পরে লালডুরে
এলো চুলে নুপুর বাজিয়ে
ওই কাশফুলের খোঁজে ওই দূরে
সাদা সাদা পেঁজা তুলোর মতো
মেঘযায়আমারসঙ্গেআর
সোনারোদ ঝিলিক দেয়
সবুজ টিয়ার ডানায়

ওই মাঠ এর দিগন্তে
আর আমি খুঁজে চলি
স্বপ্নের মেঠো পথ ধরে
এক মুঠো কাশফুল
ওই দূরে কোন মন গড়া সুদূরে

------o------

Drawing by: Alina (8 years Old)

প্রথম ইউরোপ ভ্রমণ

- শুভংকর বিশ্বাস

সড়ক ও রেলপথে দিল্লী থেকে বেলজিয়ামের ভিসা করিয়ে আনতে অহর্নিশের একটু বেশি সময় লেগে গেছে। তাই ফেব্রুয়ারি মাসের দশ তারিখে ব্রাসেলস যাওয়ার কথা থাকলেও প্রায় দু,সপ্তাহ পিছিয়ে শুক্রবার, বাইশ তারিখে যেতে হচ্ছে। বেলজিয়াম সরকারের ভি এল আই আর স্কলারশিপের আমন্ত্রণপত্র থাকায় ভিসা প্রাপ্তি নিয়ে অহর্নিশের মনে কোন দুশ্চিন্তা ছিলনা। তাই দিল্লী যাওয়ার আগেই হাতে একটু সময় রেখে বিমানের এজেন্ট মুন আপুর মাধ্যমে ইতিহাদ এয়ার ওয়েজের ব্রাসেলস গামী একটি টিকেট অগ্রিম বুক করে রেখে গিয়েছিল।

পঁচিশ বছরের টগবগে যুবক অহর্নিশ যাচ্ছে বেলজিয়ামের ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি অব লুভেনে তার মাস্টার্স অভিসন্দর্ভের জন্য পাটতন্তুর প্রকৌশল ব্যবহার নিয়ে গবেষণা করতে। এটা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ক্যাথলিক ইনিভার্সিটি অব লুভেনের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগীতাপূর্ণ একটা যৌথ গবেষণা কার্যক্রম। উক্ত দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন বর্ষীয়ান অধ্যাপক অহর্নিশের থিসিসের তত্ত্বাবধায়ক। তারপরও বিমানের ইকোনোমি ক্লাসের ছোট্ট সিটে বসে অহর্নিশ খুব চাপ অনুভব করছে। এজন্য না যে, সে প্রথম বারের মতো বিমান ভ্রমণ করছে বা একা একা সম্পূর্ন অজানা-অচেনা এক দেশে যাচ্ছে। তার চাপের মূল কারন বুয়েটের প্রতিনিধিত্ব করা। সে কি পারবে বুয়েটের সম্মান ধরে রাখতে ? যদিও অহর্নিশ ছাত্র হিসেবে খুব মেধাবী না, কিন্তু যাচ্ছে তাইও নয়। তবে গবেষণা করার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় কিছুটা বিচলিত বোধ করছে।

বিমানের চাকা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের রানওয়েতে যখন শেষবারের মত চুমু খেয়ে আকাশে উড্ডয়নক রলো, অহর্নিশের মনটা কেমন জানি একটু মোচড় দিয়ে উঠল। সে প্রথম বারের মত দেশের প্রতি একটা বিরাট টান অনুভব করতে থাকল। নূন্যতম তিনজন ব্যক্তি থাকলে দুই দলে বিভক্ত হওয়ার প্রবণতা সম্পন্ন বাংলাদেশিরা মনে হয় এই একটা ক্ষেত্রে অভিন্ন- দেশত্যাগের মুহুর্তে দেশের জন্য এক অকৃত্রিম ভালোবাসা। দেশের প্রতি চরম বিতৃষ্ণা নিয়ে দেশত্যাগের প্রাক্কালেও এই ভালোবাসার কোন তারতম্য হয় বলে মনে হয় না!

বিমান আবুধাবি বিমান বন্দরে নামলে অহর্নিশ পরবর্তী ব্রাসেলসগামী ফ্লাইটের বোর্ডিংয়ের লাউঞ্জে বসে শেষবারের মতো কাগজপত্র চেক করে নিচ্ছে। পাসপোর্ট, স্কলারশিপের লেটার, অধ্যাপকদ্বয়ের ব্যক্তিগত রেফারেন্স লেটার ইত্যাদি। সাথে আপাত গুরুত্বপূর্ণ ঠিকানা সমুহ।

অহর্নিশকে বিমান বন্দরে স্বাগত জানাতে আনিকোলান্তোস নামক একজন ভদ্র মহিলা আসবেন। তিনি ম্যাটেরিয়ালস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সেক্রেটারি। তিনিই অহর্নিশের থাকার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে আবাসিক রুম বরাদ্দ নিয়েছেন। সুতরাং ব্রাসেলস পৌঁছানোর পর

আবাসিক গন্তব্য নিয়ে অহর্নিশের খুব একটা মাথাব্যাথা নেই। তারপরও সাবধানতার জন্য সে বিকল্প পথ গুলো গুগল সার্চ করে দেখে নিল।

আবুধাবি থেকে প্রায় সাত ঘন্টার ভ্রমন শেষে বিমান ইউরোপের হার্ট হিসেবে খ্যাত বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে স্থানীয় সময় বিকাল পাঁচটার সময় অবতরণ করলো। বিমান থেকে বেরিয়ে কোন ঝামেলা ছাড়াই অহর্নিশ ইমিগ্রেশন পার হয়ে গেল। ইমিগ্রেশন অফিসারের আন্তরিকতা দেখে সে এতই মুগ্ধ হয়ে গেল যে, মনে মনে বলতে থাকলো, "আহা, বাংলাদেশের সরকার যদি বড় বড় সরকারি আমলাদের ট্রেনিংয়ের নামে হানিমুনে উন্নত দেশগুলোতে না পাঠিয়ে দেশের এই ছিঁচকে ইমিগ্রেশন অফিসারদের তালিম নেওয়ার জন্য পাঠাতো, বিদেশিদের কাছে বাংলাদেশের ভাবমুর্তি এয়ারপোর্টে প্রথম দর্শনেই এরা উজ্বল করে দিতে পারত!"

যাহোক, পরবর্তিতে ব্যাগেজ ক্যারোসল থেকে লাগেজ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে অহর্নিশ আন্তর্জাতিক আগমনী গেটে আনিকোলান্তোসকে খুঁজতে থাকলো। তখন সন্ধ্যা প্রায় ৬ টা। সারে ৬ টা..., ৭ টা.....। নাহ, কাউকেতো "অহর্নিশ" বা "আনিকোলান্তোস" নামে প্লাকার্ড হাতে দেখা যাচ্ছে না! তবে কি আনি কোলান্তোস বিমানবন্দরে আসেননি ? অহর্নিশের একটু টেনশন হতে লাগল। সারে ৭ টা...। নাহ, আর কাউকেইতো প্লাকার্ড হাতে দেখা যাচ্ছেনা বা ভাবভঙ্গিতে কেউ কাউকে খুঁজছে বলেও মনে হয়না। আনিকোলান্তোসের মোবাইল নম্বরও অহর্নিশ জানেনা। সে এবার তার বিকল্প প্লানের কথা চিন্তা করতে থাকলো। "ব্রাসেলস এয়ারপোর্টের আগমনী গেটের পাশেই লিফট দিয়ে নেমে ট্রেন স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেনে মাত্র প্রায় পঁচিশ মিনিট পরে ইলুভেন স্টেশন। তারপর, পাবলিক বাসে বা ট্যাক্সিতে চড়ে প্রায় তিন কিলোমিটার দুরে সোজা ৬৩ নম্বর নামসেস্ট্রাট, লুভেনসিটি, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল অফিস অবস্থিত। সেখানে গিয়ে দারোয়ানকে অ্যাডমিশন এবং স্কলারশিপের অফার লেটারটা দেখালেই তিনি যাবতীয় বন্দোবস্ত করে দিবেন। না হলেও নিদেন পক্ষে নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিবেন। সুতরাং, আর যাই হোক, বিপদে পরার আশংকা একেবারে নেই বললেই চলে।"

ঘড়ির কাঁটা টিকটিক করে বেড়েই চলেছে। রাত প্রায় আটটা বাজতে চলল। আর কালক্ষেপণ না করে অহর্নিশ তার পাতলা স্টাইলিশ জিন্সের জ্যাকেটটা গায়ে দিয়ে ল্যাপটপ ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে একহাতে আটাশ ইঞ্চি আর অন্য হাতে ষোল ইঞ্চির দুটি ট্রলি ব্যাগ নিয়ে টানতে টানতে রেলস্টেশনে আসলো। টিকেট মাস্টারের সাথে ভাষার জড়তা কাটিয়ে উভয়েই মাতৃভাষার বাইরে গিয়ে কোন ক্রমে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলে অহর্নিশ মনে মনে একটু গর্ব অনুভব করতে থাকল। এই প্রথম ইংরেজিতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের বাইরে গিয়ে সাধারন বেলজিক নাগরিকের সাথে মনের ভাব বিনিময় করতে পারছে! যাহোক, টিকেটের দামশুনে অহর্নিশের চোখ ছানাবড়া! মাত্র পঁচিশ মিনিটের পথ সতর ইউরো! তারমানে প্রায় দুই হাজার টাকা! যে টাকা দিয়ে একবার ঢাকা-কক্সবাজার-ঢাকা ট্রিপ দিয়ে আসা যায়!

নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান অহর্নিশের বুকে এবার কাঁপুনি ধরে গেল। কোচিং ও টিউশানি করে যে টাকা জমানো ছিল তার সাথে বন্ধুদের কাছ থেকে আরও কিছু টাকা ধার করে বিমানের টিকেট, প্রয়োজনীয় কেনা কাটা আর দিল্লী গিয়ে ভিসা করে আনার পর অবশিষ্ট সাকুল্যে মাত্র পঞ্চাশ ইউরোর একটা নোট সাথে করে নিয়ে সে এসেছে ইউরোপ জয়ের স্বপ্ন নিয়ে! অহর্নিশ জানে যে, যাওয়ার সাথে সাথে তাকে প্রাথমিক স্থাপন ব্যয় ও বই কেনা বাবদ মোট সাতশত পঁচাত্তর ইউরো দেওয়া হবে। তা দিয়ে পুরোদস্তুর মাস চালিয়ে দিয়েও হাত খরচা বাবদ বেশ কিছু ইউরো সঞ্চয় হবে। তারপরতো মাসিক বৃত্তির অর্থ আছেই। নিশ্চিত ব্যয়ে কার্পণ্য করা উচিত নয়। তাই সবেধন নীলমনি ৫০ ইউরোর নোটটা ওয়ালেট থেকে বের করে টিকেট কেটে লুভেনে যখন আসলো তখন রাত প্রায় পৌনে নয়টা।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে অহর্নিশ প্রথমবারের মতো ইউরোপের আসল আবহাওয়া টের পেলো। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি, স্টেশনের সামনে বিলবোর্ডে তাপমাত্রা দেখাচ্ছে ২ ডিগ্রী সেলসিয়াস। তবে সব কিছু ছাপিয়ে এখন সবচেয়ে বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে পেটের ক্ষুধা! পকেটে মাত্র তেত্রিশ ইউরো। হাতে-ঘাড়ে মিলিয়ে তিনটি ব্যাগ। ট্যাক্সি নেওয়ার সাহস নেই পাছে না খেয়ে থাকতে হয়। শুক্রবার সব অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। এমন কি স্টেশনের সামনে বেশকিছু বিপনি বিতান দেখা যাচ্ছে, তাও বন্ধ। মানুষ-জন নেই বললেই চলে। তবে কি কাঙ্খিত গন্তব্য নামসেস্ট্রাটের ইন্টারন্যাশনাল অফিসে এখন কাউকে পাওয়া যাবেনা? অহর্নিশ নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিল। কি দরকার ছিল শুক্রবার, তাও অফিসের সময়ের পর বেলজিয়ামে আসা? পরদিন শনিবার ও রবিবার-দু,দিনই সাপ্তাহিক ছুটি। যদি কোন বিপদ হয় সেটা কমপক্ষে আড়াইদিন স্থায়ী হবে।

এদিকে পেটের ক্ষুধা আর সামনে অনিশ্চিত গন্তব্য অহর্নিশকে উন্মত্ত বানিয়ে ফেলেছে। ক্ষনিকের জন্য বৃষ্টি থামলে সে পায়ে হেঁটে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। প্রচন্ড শীতে তার হাতের আঙুলের ডগায় ব্যাথা শুরু হয়ে গেছে। শীতের হ্যান্ড গ্লভস আর হেব্বি জ্যাকেট অহর্নিশ এনেছে বটে, কিন্তু কোন ব্যাগের কোন কোণয় পড়ে আছে তা সে জানেনা। তাছাড়া সে সময়টুকুও এখন নেই। এমনিতেই ইন্টারন্যাশনাল অফিসে কাউকে পাওয়ার আশা মিটিমিটি করে জ্বলছে। রাত গভীর হলে সেটাও দপ করে নিভে যাবে।

কিছুদুর যাওয়ার পর উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসা একটা নেপালি দম্পতি অহর্নিশের অবস্থা অনুধাবন করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। অহর্নিশ তার গন্তব্যের ঠিকানা বললে দম্পতি প্রায় এক কিলোমিটার পথ তার সাথে গিয়ে এগিয়ে দেয়। তারপর নাম সেস্ট্রাটের শুরুটা দেখিয়ে দিয়ে বলে যে, এই পথ ধরে আধাকিলোমিটার পেরুলেই ইন্টারন্যাশনাল

অফিস। সাথে দম্পতি এটা বলেও সতর্ক করলো যে, এখন সেখানে কাউকে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। একমাত্র সম্ভাবনা যদি সেখানে কোন প্রোগ্রাম থাকে।

নামসেস্ট্রাটের দুই পাশ দিয়ে ছোট ছোট অনেক বার, রেস্টুরেন্ট খোলা। বারের ভিতরে অনেক তরুন-তরুনী কে মিউজিকের তালে তালে নাচতে দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন বার এবং রেস্টুরেন্ট থেকে বিভিন্ন ধরনের মিউজিক চারিদিক থেকে ভেসে আসছে। এসব দেখে অহর্নিশ কিছুটা আশ্বস্ত হলো। না, তরুন-তরুনীর উদোম নৃত্য তাকে ভোলাতে পারিনি। ইন্টারন্যশনাল অফিসে যদি সত্যিই কেউ না থাকে, তবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে এই আশায় সে কিছুটা পুলকিত বোধ করছে।

যে আশংকা ছিল সেটাই হলো। ৬৩ নম্বর নামসেস্ট্রাটে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল অফিসে তালাবদ্ধ। আর দারোয়ান প্রথা যে ইউরোপে চলেনা, সেটা এই তিন কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রমকালে অহর্নিশ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। ট্রানজিটসহ দীর্ঘ প্রায় পনের ঘন্টার বিমান ভ্রমণ শেষে এই তিন কিলোমিটার হাটার পথ যেন মাউন্ট এভারেস্টের শেষ তিন ,শমিটার ট্রেকিং! তাই ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত অহর্নিশের মধ্যেও এক ধরণের বিজয়ীর আভা ঝিলিক দিচ্ছে।

ইন্টারন্যশনাল অফিসের ঠিক উল্টা দিকে ক্যাথলিক ইউনিভারসিটি অব লুভেনের লোগোসম্বলিত একটি ভবনে মানুষের কথার আওয়াজ শুনে অহর্নিশ কোন রাখ ঢাক ছাড়াই ব্যাগসমেত ঢুকে পড়লো। সেখানে প্রায় জনা বিশেক লোক বিয়ার, ওয়াইন বা শ্যাম্পেন এবং হালকা স্ন্যাকস খেতে খেতে খোশ গল্পে মেতে ছিলো। অহর্নিশ ঢুকতেই অনেকে তার দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকালো। অহর্নিশ ব্যাগ ছেড়ে দিয়ে একটা হাত উঁচিয়ে ইশারা করলে বয়েসে তরুণ একজন এগিয়ে আসলো। স্কলারশীপের অফার লেটারটা তরুণের দিকে এগিয়ে দিয়ে সেখানে লেখা ইন্টারন্যাশনাল অফিসের মিস ইনগেভ্যান ডারভ্যারেন বা এখানকার তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ইগনা সভারপোস্টের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করে। তরুনটি সম্ভাব্য বিপদ আঁচ করতে পেরে অহর্নিশকে দাঁড় করিয়ে রেখে একজন বয়োজেষ্ঠ ভদ্রলোকক ডেকে নিয়ে আসেন। বয়োবৃদ্ধ নিজেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিওলজির প্রফেসর পরিচয় দিয়ে অহর্নিশের কাছে বিশ্ববিদালয়ের লেটারটা চাইলেন। সেটা দিলে তাতে চোখ বুলিয়ে বললেন, "এখন তুমি ইন্টারন্যাশনাল অফিসের কারও কাছে সাহায্য পাবেনা হে বাপু! কাল এবং পরশুও সাপ্তাহিক ছুটি। সোমবারের আগে মনে হয়না তুমি তোমার আবাসিক ব্যবস্থার কোন সুরাহা করতে পারবে। তবে তোমার তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ভারপোস্ট আমার পরিচিত একজন বন্ধু। আমি তোমাকে এই দুইদিনের জন্য এখানকার ইন্টারন্যাশনাল হল `পাঙ্গায়া,তে রাখার চেষ্টা করছি। এটা এখান থেকে খুব নিকটেই অবস্থিত। চলো আমার সাথে।" অহর্নিশের বড় ব্যাগটা চেয়ে নিলো প্রফেসর । আর অহর্নিশ ছোট ব্যাগ হাতে এবং ল্যাপটপ ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে দুজনে পাঙ্গায়ার উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করলো। যেতে যেতে বুড়ো প্রফেসর বললেন, "দেখো তোমাকে আমি আমার বাসায় নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু বাসায় বিনা নোটিসে তোমাকে নিয়ে গেলে আমার বউ তোমার সাথে আমাকেও বাসা থেকে বের করে দিবে। শেষে দুজনকেই এই হলে এসে থাকতে হতে পারে। তাই তোমাকে আথিতেয়তা দিতে পারছিনা বলে দুঃখিত।"

১০ মিনিটের মধ্যেই তারা পাঙ্গায়াতে চলে আসলেন। প্রফেসর নিজের পরিচিতি ব্যবহার করে হলের আবাসিক প্রেসিডেন্টকে সাপ্তাহিক ছুটির এই দুদিনের জন্য অহর্নিশকে রাখার অনুরোধ করলেন। হলের প্রেসিডেন্ট অহর্নিশের এডমিশন লেটার এবং প্রফেসরের আইডি কার্ড ফটোকপি করে রেখে প্রফেসরের কাছ থেকে একটা ফর্মে সই নিয়ে নিলেন। সব কিছু মাত্র পাঁচ মিনিটেই শেষ হয়ে গেলো। পরে প্রফেসর তার মোবাইল নম্বরটা দুজনকে দিয়েই বিদায় নিলেন।

হলের প্রেসিডেন্ট এরিক একজন অমেরিকান। স্ত্রী সহ এই হলে থাকেন। এখানে ছেলেদের বামেয়েদের জন্য আলাদা কোন হল নেই। এরিক আর্কিটেক চারে পিএইচডি করছেন। অতিরিক্ত ইনকাম সোর্স হিসেবে হলের এই দ্বায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি অহর্নিশের দুইটা ব্যাগ ইহাতে উঁচিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে সেখানকার একটা রুম অহর্নিশকে বুঝিয়ে দিলেন।

ব্যাগগুলো রেখে কোন ক্রমে ড্রেস পরিবর্তন করে বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়েই অহর্নিশ নরম বিছানায় গা হেলিয়ে দিলো। এদিকে ক্ষুধাত খন অহর্নিশ কে আরও পেয়ে বসেছে। এখন আবার ছুটতে হবে খাবারের সন্ধানে! ইশ, ব্যাগে করে দেশ থেকে যদি কোন খাবার আনা যেত! এয়ারপোর্টে খাবার গুলো ফেলে দেওয়ার ভয়ে কোন শুকনো খাবার পর্যন্ত সে আনেনি।

বাইরে কনকনে শীত থাকলেও হলের ভিতর ততটা শীত অনুভূত হচ্ছে না। তারপরও তাপমাত্রা কমফোর্ট জোনের নিচে থাকায় অহর্নিশ বিছানা থেকে উঠে রুমের মধ্যে এটাচড ওয়াটার হিটারের নব ঘুরিয়ে এর কার্য পদ্ধতি বোঝার চেষ্টা করছে। এ সময় দরজায় ঠকঠক শব্দ করে বলে, আমি এরিক। আমার বউ তোমার জন্য কিছু রান্না করেছে। তুমি চাইলে আমার সাথে খেতে আসতে পারো। মনে হয় ঈশ্বর স্বর্গ ছেড়ে মর্তে এসেছেন অহর্নিশকে সাহায্য করতে! আবার এমনও হতে পারে ঈশ্বর নানারূপে উন্নত দেশ সমুহে ঘুরে বেড়ায়। নাহলে মাত্র তিন ঘন্টার ব্যবধানে নেপালি দম্পতি, আর্কিওলজির প্রফেসর, আর এরিক ও তার স্ত্রী, এই পাঁচজন মহা-মানবের সাথে দেখা মেলে!

এরিককে অপেক্ষায় না রেখে দরজা খুলে সে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ চিত্তে নৈশভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলো। এরিকের বউ এলেনা একজন হিস্পানিক আমেরিকান। সে অহর্নিশকে ইন্ডিয়ান ভেবে মাংস রান্নার মধ্যে যায়নি। তিনি শুধু মায়োনিজ আর টমেটো সস দিয়ে পাস্তা রান্না করেছে। এটাই ক্ষুধার্ত অহর্নিশের কাছে অমৃত স্বাদের। রাতের খাবারের নিমন্ত্রণ যে বিলাসিতা ছাড়াও মাঝে মাঝে অতি প্রয়োজনীয় হতে পারে, এটা বোধ হয় তারই এক জ্বলন্ত বহিঃপ্রকাশ! আহার সেরে শেষমেষ অহর্নিশ নিজের বিছানায় গিয়ে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত চোখের পাতা দুটি এক করলো পরম তৃপ্তি নিয়ে।

------o------

Compassion knows no boundaries

-Rita Afsar PhD

There is an age-old proverb that says 'the more you give unconditionally, the more it grows' and this is about knowledge. I strongly believe that the same goes with compassion. The more you practice an act of random kindness not only you will feel happy and content, but also happiness will be spread far and wide. As Helen Keller has well said "Nobody has the right to consume happiness without producing it."

Yes, my readers, I am writing this piece to draw your attention to compassion and other virtues of humanity that still exist and make this world so beautiful! This renewed trust in human virtues is very important, especially in times of uncertainty and anxiety when fake news, misinformation and politicization of issues tend to be pervasive. Just think how COVID-19 pandemic has changed the dynamics of human relations with many political leaders, mainstream media and even a few segments of population becoming increasingly nationalist in orientation often underplaying values such as compassion, common good and common interest or 'live and let live'.

COVID-19 pandemic: crunch in compassion?

The crunch in compassion is immediately evident when at the first instance of the pandemic, governments across the world introduced stringent measures to stop migration and mobility to 'flatten the curve' of infections. Travel restrictions are passed to contain the virus, including by prohibiting entry of residents from other countries, and some countries have closed their borders entirely. Labour migration has been temporarily suspended in some countries while, in others, migration processing and assistance to asylum seekers are being slowed down.

Between 11 March 2020 when the World Health Organization (WHO) declared COVID-19 a pandemic, and 12 July 2021, there were 109,956 movement restrictions around the world according to the International Organisation for Migration (IOM).Based on a zero-growth scenario in the number of migrants between 1 March and 1 July 2020, globally a decrease of nearly two million international migrants has been predicted by the United Nations, from the initial estimates done between mid-2019 and mid-2020. For example, Australia granted 79,620 skilled stream visas in the 2020-21 financial year, which was almost only one-quarter of visas granted in 2018-19 and well below the highest figure of about 128,000 that began dropping from 2016. According to the Australian Centre for Population, negative net migration for the first time since 1945 will lead to the lowest population growth in a century [https://www.migrationdataportal.org/themes/migration-data-relevant-covid-19-pandemic].

Globally, the number of new asylum applications lodged in the first half of 2020 was 32 per cent less than the number during the same period in 2019 (FINAL-2020-OECD-ILO-UNHCR-IOM-G20-report.pdf). Compared to their forecasts, the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR's) revised estimates highlight approximately 1.5 million fewer refugees and asylum-seekers arrived in 2020 than would have been expected without COVID-19.

It is important to note that global pandemic like COVID-19 affects everyone but makes migrants more vulnerable. Due to border closures, restrictions on movement accompanied by racial discrimination and hatred in many instances, migrants often experience double or even triple jeopardy of economic loss along with social isolation and stigma leading to serious implications for them and their families in terms health including mental health and wellbeing. Feelings such as helplessness or powerless are rampant across communities worldwide, which provides insights into the daily struggles faced by displaced persons around the world every day. Also, it provides grounds for renewing empathy and compassion, which I would like to focus by narrating my two real life stories.

Random acts of kindness

Episode 1: Inter-State travel from Delhi to Nagpur

It was my first interview call from a university college at Nagpur in the Indian State of Maharashtra, outside my hometown – Delhi. Being a young girl of early 20s,

obviously my father was anxious as I had to travel interstate for more than 17 hours by train and stay in one of our relative's (brother of my eldest brother-in-law's) house for a couple of days. I boarded the Grand Trunk Express that travels between Delhi and Chennai touching Nagpur on the way in one fine evening and safely occupied my allocated berth. For those who are not familiar, berth is a bed, usually stacked like bunk beds, on a train. This arrangement enables an overnight train passenger to sleep, instead of sitting up all night, while the lower berth becomes a seat for three people and the middle berth becomes a backrest at other time. My father came inside the train to see me off.

As we were much ahead of the scheduled departure time, we were having casual conversation. I didn't remember how much time we spent chatting but do still remember that suddenly my father greeted and told a co-passenger who was also roughly of his age to take care of me. I was a bit offended as I then felt that he undermined my capacity to look after myself. Anyways, soon there was a green signal and my father descended and gradually his shadow disappeared in the darkness.

Having had a light dinner at home, I climbed to my berth at the top and soon fell asleep while reading a novel. I didn't remember what time it was but can say that it was dead of night when I was awakened by my co-passenger. He was calling me gently and when I woke up, softly but firmly informed me that the train will not go further as there was severe floods that blocked the railway track for this route. This was enough to ring alarm bell although I tried to keep my cool and started packing my belongings. He then advised that we must take another train from a different station that involved a fair bit of walk 4/5 Kilometers. The other option was hiring a rickshaw if we were lucky to get one.

When we descended from the train, there was knee-deep or even deeper water all over and it was raining. Fortunately, he managed to hire a rickshaw and told me to climb into it, which I did without saying a word considering the gravity of the situation. While I occupied one portion of the seat, the other portion was used for keeping our baggage. It took quite some time to reach the station and he walked all the way. I din't remember much about the next train and how we boarded in.

Picture: Nagpur Junction Railway Station

However, I could still recollect that when we reached Nagpur station, he hired an auto-rickshaw and dropped me to relatives' house next evening. I introduced myself to my relatives whom I met for the first time but who were eagerly waiting for me since my brother-in-law already wrote to them about of my arrival. I also told them how this stranger (whom I addressed as uncle) helped me to overcome such a crisis. However, we didn't have much opportunity to show our hospitality, as he left soon to meet his anxious family members. He politely bade goodbye to us saying that he did nothing unusual and then resumed his journey by getting into the same auto to reach his destination.

Next morning, I attended the interview as scheduled and was offered the job. I never met my uncle, but always thanked him from the core of my heart for his unconditional compassion and, the departed soul of my beloved father for his prudence.

Episode 2: Overseas travel Dhaka-Nairobi

In the late 1980s, when Susan Davis of Ford Foundation Dhaka, now a world leader in civil society innovation and international development, the founder of BRAC USA, a non-governmental organization that seeks to improve the lives of the poor families in Africa and Asia, offered me a consultancy to evaluate a women's cooperative in Kenya, I was very excited. Travelling to Kenya and African continent was as much the source of my excitement as was the task in hand that involved impact analysis of a Ford Foundation funded women's cooperative in Kenya and make necessary recommendations.

I was accompanied in this trip by an early-career woman lawyer who was supposed to review the legal aspects of the cooperative. As there was no direct flight from Dhaka to Nairobi, we first flew to Bombay (now

Mumbai) to avail Air India flight that goes straight to Nairobi. Our flight was delayed by several hours. As a result, we reached Nairobi airport around 1/2.00am in the morning instead of scheduled arrival time at 4/5.00pm in the afternoon. I must say that there were not many passengers in the flight and when I changed my seat to watch a movie, I met an Indian co-passenger. By nature, I do not easily mingle with strangers. In this case too, I didn't feel very comfortable when this gentleman introduced himself and his family in Kenya and asked about myself and the purpose of our trip. I tried to dissuade him by being brief in my conversation and concentrated in the movie.

The airport was very quiet with only a few people and the officers on duty. As we completed immigration formalities and approached the exit gate, we heard our names were announced. Soon after, a strongly built African man approached us and said that he was sent by the Ford Foundation Nairobi office to drop us to the hotel where they booked our accommodation. Although I was very young, it was not my first overseas trip. From my experience, I knew that the drivers who are supposed to pick us up first show a placard to enable us to identify them and then produce relevant papers before we could accompany them to the designated vehicle to reach the accommodation or venue. Therefore, I was surprised that he didn't have a placard in the first place, but asked him to show papers in order to validate his claims. At this, he got angry and shouted that if we didn't comply, he would complain to our host, the Ford Foundation, Nairobi office and nobody would come to pick us up.

Then the Indian co-passenger came forward and interrogated in which hotel he would take us. All the names that he suggested such as Norfolk hotel, Sarova hotel, etc. turned out to be fake when the Indian gentleman telephoned each of these hotel receptions and found no bookings been made for us. He then advised that this deserted airport wouldn't be safe for us to wait anymore rather he and his family would be happy to have us as guests pointing to his wife and sister who were waiting outside the lobby. As there was no other option and sensing that we were in the middle of a high-risk situation, we agreed. The Patel family really welcomed us and showed great hospitality by offering nice hot food as super and safe and comfortable stay overnight.

Next morning, our kind stranger's wife and sister dropped us to the Ford Foundation office. To our astonishment, we learnt that our arrival details were wrongly faxed to the New York Office, hence, Nairobi office had not made any arrangements to pick us up. Once again, I looked up to the sky to thank the random kindness of the co-passenger who really saved us from a grave danger.

Along with my experience of compassion that I treasure most, the African safari and visit to regional cities of Mombasa and Kisumu are also enlivened in my memory. In case you are interested about the project, I must say that we recommended for continuity of the funding. I was mainly impressed by the desire for children's good education that was the dominant motivation for most of these women members who joined the cooperative. Given that education is the best bet to development and generation change, I cannot think of any better alternative

------o------

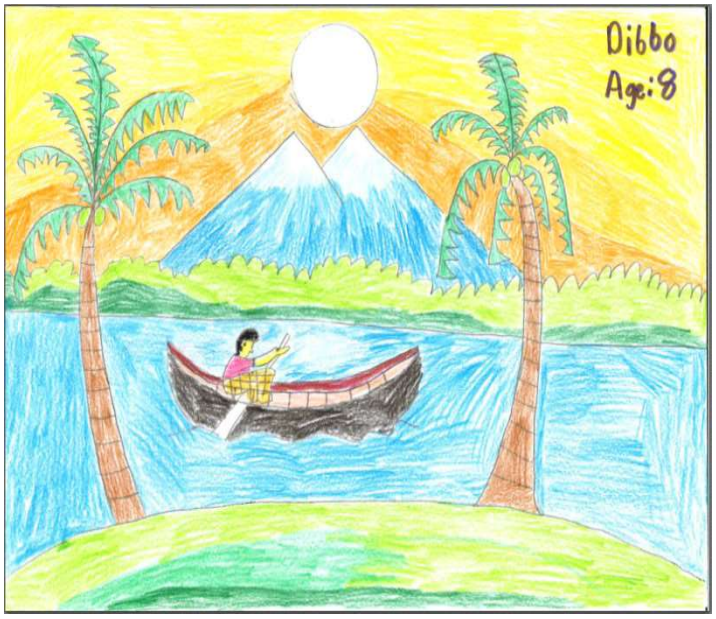

Drawing By: Dibbo, 8 years Old

গাধাদের গল্প

- কমলেশ রায়

এক.

অনেকদিন আগের কথা। তখনও বিদ্যুৎ আবিস্কার হয়নি। খ্যাতিমান এক লেখক বড়সড় একটা হাই তুললেন। তাতে তৃপ্তির ছোঁয়া। পান্ডুলিপি শেষ। নিজেকে যথেষ্ট ভারমুক্ত মনে হলো তার। তখন গভীর রাত। চারপাশ নিঝুম। এক পা দু,পা করে বারান্দায় এলেন তিনি। সোনা গলা জোছনা। তারমন ভরে গেল। হিমেল বাতাস। তারার ঝিকিমিকি। কুকুরের ঘেউ ঘেউ। অপার্থিব এক পরিবেশ। লেখক পুরোপুরি আচ্ছন্ন।

কতটা সময় এভাবে কেটেছিল বলা মুশকিল। পোড়া গন্ধ নাকে নাকে আসতেই ঘোর কাটল। দৌড়ে ভেতরে গেলেন লেখক। ততক্ষণে সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে। কাজটা করেছে আদরের বিড়াল। লণ্ঠন উল্টে দিয়েছে পান্ডুলিপির ওপর। গন্ধটা সেখান থেকেই বেরুচ্ছে।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ঝিম মেরে বসে রইলেন লেখক। ধোঁয়া উপেক্ষা করে। আগুন নেভানোর চেষ্টাও করলেন না। করেও কীলাভ! গন্ধ বেড়ে আরও উৎকট হয়েছে। ঘুম ভাঙায় ছুটে এলেন এক নারী। লেখকের যাবতীয় সুখ-দুঃখের অংশীদার। সব শুনে বললেন, `তুমি একটা আস্ত গাধা। নাও আবার নতুন করে লেখো।, এরপর পর মমমতায় জড়িয়ে ধরলেন লেখককে। নারী থেকে মানবী হয়ে সচেষ্ট হলেন পান্ডুলিপি পুড়ে যাওয়ার দুঃখ ভুলিয়ে দিতে।

দুই.

গল্পটা হালের। ল্যাপটপ খুলে মাথায় হাত। জনপ্রিয় লেখকের কপালে ভাঁজ। প্রায় শেষ হয়ে আসা উপন্যাসের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ফাইল ওপেন করার পর সাদা মাটা ইংরেজি বাক্যে যন্ত্রটা সেটাই জানাচ্ছে। অনেক চেষ্টার পরও কিছুই সম্ভব হলোনা। মাথা গরম হয়ে দপদপ করছে। মোবাইলে ধরলেন বান্ধবীকে। যে কিনা একটা কম্পিউটার কোম্পানিতে উচ্চপদে আসীন। যন্ত্রটাকে বেশ ভালই বোঝেন।

বিস্তারিত শোনার পর তরুনী শ্লেষ ভরে বললেন, `তুমি দেখছি পুরোপুরি একটা গাধা। ব্যাক-আপ রাখলেই পারতে।, তারপর অদ্ভুত মাদকতা জড়ানো গলায় বললেন, `মন খারাপ করোনা। অফিস থেকে সরাসরি তোমার ফ্ল্যাটে আসছি মন ভাল করে দিতে। তারপরও যদি ক্ষতি না পোষে, তবে না হয় লং-ড্রাইভে যাব। কি রাজি তো?,

তিন.

এবারের কাহিনী নিছক কল্পনার। ঈশ্বরের সামনে বসে আছেন ওই দুই লেখক। দু,জনেরই ভীষণ মন খারাপ। ঈশ্বর সব জান্তা। তিনি জানেন কেন এদের মন খারাপ। তবুও সৌজন্যতার খাতিরে জিজ্ঞেস করলেন, `আপনাদের মন খারাপ কেন?,

দুই লেখক প্রায় সমস্বরে বললেন, `আচ্ছা, লেখকরা কি গাধা?,

জবাবে ঈশ্বর ম্লান হাসলেন। তারপর গভীর গলায় বললেন, `প্রত্যেক সৃষ্টিশীলই গাধা। যেমন আমি; ধুরন্ধর মানুষ আর এই মহাবিশ্বের মোট বয়ে বেড়াচ্ছি।,

দুই লেখক পরস্পরের দিকে তাকালেন। কী বলবেন ভেবে পেলেন না। তবে তাদের মন ভাল হয়ে গেল।

------o------

Drawing by: Alina (8 years Old)

নাটিকা: করোনা

- শর্মিষ্ঠা সাহা

ধারা বর্ণনা : সময়কাল ২০১৯ সালের শুরু, স্থান করোনা ভাইরাসের সভাকক্ষ। সার্স ভাইরাস জনিত মহামারির পরে অনেকদিন পার হয়ে গেছে। মানুষ করোনা সংক্রান্ত রোগ বালাইয়ের কথা প্রায় ভুলতে বসেছে। করোনা গং ভীষণভাবে বিমর্ষ, কেমন একটা boring সময় যাচ্ছে – কিছুই ভাল লাগছে না। স্বয়ং করোনা তার সাঙ্গপাঙ্গের দু:খ বুঝে কিছু করার জন্য ছটফট করছে।

দৃশ্য ১

করোনা: কি খবর করোনা গং। সবাই কেমন ঝিমিয়ে গেছ বলে মনে হচ্ছে।
আলফা: এমন নিরামিষ জীবন আর ভাল লাগছে না।
বেটা: একদম ঠিক কথা।
গামা: কিছু একটা করা দরকার।
করোনা: আমিও তো তাই বলি, কিছু করা দরকার।
ডেলটা: মানুষ খুব বুদ্ধিমান...
আলফা: হ্যাঁ, আমরা ওদের সাথে ভাল পেরে উঠছি না।
ল্যামবডা: কতদিন হয়ে গেল আমরা নিউজে নাই।
করোনা: হুম্ ... মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, চল দেখি কি করা যায়।
(সবাই বেরিয়ে যায়)

দৃশ্য ২

(গাছ, পশু, পাখি, মাছের সমাবেশ।)
গাছ:আজ আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করব। তোমরা জানো, মানুষের বাড়াবাড়িতে আজ আমাদের জীবন অতিষ্ঠ। ওরা বনের পর বন কেটে ফেলছে।
বাঘ: ঠিক বলছো।
হরিণ: আমাদের থাকার কোন ভাল জায়গা নেই।
পাখি: বায়ু দূষণে আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসে।
মাছ: জেলেদের জন্য আমরাতো ঠিকমত বড়ই হতে পারি না।
বাদর: আমাদের খাবারের বড় অভাব।
গাছ: এরকম চললে আমরা শেষ হয়ে যাব। প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হলে মানুষও শেষ হয়ে যাবে।
ব্যাঙ: একদম ঠিক, একদম ঠিক।
প্রজাপতি: কিন্তু কি করব আমরা?
(করোনা গং এর প্রবেশ।)
বাদর: ওরে বাবা ..
ব্যাঙ ও প্রজাপতি: কি হলো?
বাদর: ওই যে ... (করোনাদের দেখিয়ে)
করোনা: আরে ভয় পেয়ো না, আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করব না।
আলফা: আমরা তোমাদের সাহায্য করতে চাই।
হরিণ, পাখি ও মাছ: সত্যি বলছ?
গামা ও ল্যামবডা: হ্যাঁ, সত্যি বলছি।
করোনা: আমরা মানুষকে এমন ভয় দেখাব যেন ওরা কিছুদিন ঘর থেকে বের না হয় ।
বেটা: ওরা বাইরে না গেলে বায়ু, পানি, মাটি দূষণ কমে যাবে।
ডেলটা: তোমরা শান্তি পাবে।
আলফা: তোমরা যার যার বাড়ি চলে যাও আর আমাদের খেলা দেখ।
গাছ: ঠিক আছে, দেখি তোমরা কি করতে পার। এই তোমরা সবাই চল।
(গাছ, পশু, পাখি, মাছ বেরিয়ে যায়।)
করোনা: আমাদের আরও শক্তিশালি হতে হবে।
আলফা: দ্রুত একজন মানুষ থেকে অন্য জনের দেহে পৌঁছতে হবে কৌশলে।
ল্যামবডা: ঠিক তাই ..
করোনা: আপাতত যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে ঝাপিয়ে পড়। কাছেই যে মানুষটি আছে সেখান থেকেই শুরু করো।

দৃশ্য ৩

(গাছ, পশু, পাখি, মাছ সবাই আনন্দে নাচছে "আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে„ গানের সাথে। ভিডিও কলে করোনা গং দেখছে। কিছুক্ষণ দেখে রিমোট দিয়ে বন্ধ)
করোনা: বাহ্ বাহ্ কি আনন্দে আছে ওরা। চারিদিকে কোন মানুষ নেই। সবাই ঘরে বসে আছে। কেউ ওদের বিরক্ত করছে না।
আলফা: আমরা তোমার কথা মত কোন মানুষ প্লেনে ওঠার ঠিক আগে তার শরীরে ঢুকে যাই।
বেটা: আর এভাবে আমরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছি।
করোনা: খুব ভাল, আমি তোদের কাজে খুব খুশী।
গামা: কিন্তু আমিতো কিছুই করতে পারছি না।
করোনা: মন খারাপ করিস না গামা। তোকে আরও শক্তিশালী করে উত্তর আমেরিকাতে পাঠাব।
ডেলটা: আমার কাজ কি?
করোনা: আলফা আর বেটা দক্ষিণ এশিয়াতে বেশি ভাল করতে পারছে না। তুই ওখানে যাবি ডেলটা।
ডেলটা: ঠিক আছে।
করোনা: তোকে এমনভাবে তৈরি করেছি যেন বাতাসে ছড়াতে পারিস। এবার দেখি মানুষ আমাদের ঠেকায় কি করে।
ল্যামবডা: আর আমি?
করোনা: তুই আমার গোপন অস্ত্র ল্যামবডা। আপাতত চুপচাপ, পরে যাবি দক্ষিণ আমেরিকা।
আলফা: শুনেছি মানুষ আমাদের তাড়াতে ভ্যাকসিন বানিয়ে ফেলেছে।
করোনা: চিন্তা করিস না, এতা মানুষকে ভ্যাকসিন দিতে অনেকদিন লাগবে।
বেটা: ততদিন পৃথিবীতে আমাদেরই রাজত্ব।
করোনা: আর ওরা ভ্যাকসিন নিলেই কি, আমরা নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে ফিরে আসব। যেমন ল্যামবডা, হা হা হা .

গামা ও ডেলটা: হুররে..

(করোনার দলের গান ও নাচ– „আমরা নতুন যৌবনের দূত„ গানের সুরে।)

গান: আমরা করো ভাইরাসের দল
আমরা ঘাতক, আমরা জঞ্জাল
আমরা করো ভাইরাসের দল
আমরা জীবন কাড়ি, আমরা জগত জুড়ে আনি অতিমারি
মানুষের জাড়িজুড়ি ভন্ডুল করে দেই ... আমরা উত্তাল
আমরা ঘাতক, আমরা জঞ্জাল
আমরা করো ভাইরাসের দল।

(গাছ, পশু, পাখি, মাছের প্রবেশ)

করোনা: তোমরা সবাই কি মনে করো?

গাছ: তোমরা বলেছিলে মানুষকে ভয় দেখাবে।

বাঘ: এভবে মানুষ মারছো কেন?

হরিণ: কেন মারছো?

আলফা: সে কি, আমরা তো তোমাদের ভালোর জন্যই করছি।

পাখি: আমাদের ভাল করতে হবে না।

মাছ: মানুষ না থাকলে কোন মজাই থাকবে না।

প্রজাপতি: আর মানুষ মারলে তোমাদের সাথে আমরা নেই।

বাদর ও ব্যাঙ: নেই ... নেই ..

দৃশ্য ৪

(দুজন বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে)

বৈজ্ঞানিক ১: আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে।

বৈজ্ঞানিক ২: কি ব্যাপার বস্, আজ খুব খুশী দেখছি।

বৈজ্ঞানিক ১: আরে কোভিড ভ্যাকসিন ট্রয়াল সফল।

বৈজ্ঞানিক ২: সব ঠিকমত কাজ করছে?

বৈজ্ঞানিক ১: করছে মানে, একেবারে একশভাগ।

বৈজ্ঞানিক ২: ওরে বাঁচাধন করোনা, তোমার মানুষ মারার দিন শেষ হয়ে আসছে।

বৈজ্ঞানিক ১: তুমি তাড়াতাড়ি সবাইকে ভ্যাকসিন দেবার ব্যবস্থা কর।

বৈজ্ঞানিক ২: আমি এখুনি ওদের নিয়ে আসছি।

(বেরিয়ে যায় এবং অন্যদের নিয়ে ফিরে আসে। সবাই ভ্যাকসিন নিয়ে বেরিয়ে যায়।)

দৃশ্য ৫

করোনা: কি হল সব, মন খারাপ কেন?

ডেলটা ও বেটা: সব মানুষ ভ্যাকসিন নিয়ে আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসছে।

ল্যামবডা ও গামা: এবারের মত আমাদের দিন শেষ।

(বৈজ্ঞানিকদ্বয়সহ মানুষের প্রবেশ)

মানুষ: আমরা মানুষ, সৃষ্টির সেরা – করোনা অতি ক্ষুদ্র তোরা ..

করোনা গং: ছোট বলে করোনা হেলা –জানটা বাঁচাও এই বেলা ..

মানুষ: টিকা এল মোদের ঢাল, ছিন্ন হল তোদের জাল ...

করোনা গং:বা .. বা .. সব ভ্যাকসিনওয়ালা – পালা সবাই পালা ...

(করোনা গং বেরিয়ে যায়, মানুষের বিজয় উল্লাস)

(ব্যাকড্রপ ভিডিও তে দেখা যায় করোনা গং)

করোনা গং: শোন হে মানুষ, আমরা -
আবার আসিব ফিরে, শত মানুষের ভীড়ে
এই পৃথিবীতে, হয়ত কোভিড নয়
নতুন কোন রূপে, নতুন ঝামেলা নিয়ে ...

ধারা বর্ণনা : পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার মত অনুজীব। যুগেযুগে এরা মানব সভ্যতার জন্য হুমকি সৃষ্টি করেছে মহামারি অতিমারি দিয়ে। মানুষ তার মেধা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির মাধ্যমে এসব প্রতিহত করেছে বারবার। কোভিড ১৯ অতিমারিকেও আমরা জয় করব ভ্যাকসিন দিয়ে।

------o------

Drawing by: Prithul Bisshay

What You Call a Nightmare…

- Shayan Dash , 10 Years

It was a pretty average day to the 'Best Buddies', or BB squad. I'm pretty sure that your thinking 'What on Earth is that!'. I'll get to that in a second. Secondly you are going to get pretty bored if I said 'pretty' again. So I'll stop. Anyway, the BB squad consisted of 3 people, 3 very stubborn people Josh ,Kit and Alita. Our story begins in the BB squad 'HQ', AKA, a park.

"Do you seriously want to spend the first day of the holidays with dead people?" Josh asked. He was a tall, lean looking child of 12. If you picked one single word to describe him, he'd be very disappointed in you, because he believed a wide range of vocabulary is extremely important.

"But they are buried, come on!" argued Kit desperately trying to have a glimpse of what afterlife looks like, out of a hole in the playground fence. "It's not like their zombies! It's just a cemetery. Furthermore, it's so overgrown, it's basically an overgrown park!" (I'll keep a mental note to not to write too many 'it's' next time.)

"Still," Josh added in desperation, "We just CAN'T go!"

As you probably presumed, it was the beginning of a totally nice school holidays! (Totally). Kit, Josh and Alita were deciding, not arguing (totally), what to do. From the title and everything you have read so far you can probab-. Ohyeah, if I tell you this it's probably going to spoil the story. Continuing…

"Let's just go to the library!" Alita explained, just like in a movie when someone is dying, Superman swoops in and then helps them, "I need toget a very important book, it's basically a matter of life and death. Plus, there are absolutely zero, nothing, zip, zilch, nada dead bodies there? Right?"

"Yet," said Kit darkly. "What if I die of boredom?" Alita was about half of Kit's size in every direction. His eyes were emerald, green, his skin was light brown, (probably because he spent too much time playing Beach Cricket). If you could choose one word to describe him, it would most likely be intense. Josh sat upright making excited gestures with his hands. His entire vocabulary career started in the library.

"How will you die of boredom? The library is so, so, so cool!"

"But the library is just s- 'bluuuuurrggh" Kit cried trying to turn the tables.

"Majority wins!" Alita presented proudly, while Josh nodded his head vigorously.

"Uurgh, FINE! I'll go," Kit answered in depression and distraught. They drove to the library. (Oops, I might have a slight error in that sentence, let me re-write it,) Alita's mum drove them to the library. The trio (a duo, because Kit wasn't interested that much) searched for abook. Alita found that book he said was 'a matter of life a death'. It was actually called, 'A matter of life and death!' Meanwhile, Kit was sulking in the corner of the library, doing nothing.

"I don't like words, let alone books!" moaned Kit

"Come on, give 1 book a try, if you don't like it we'll go home," said Alita sorrowfully, whilst Josh shook his head vigorously (Meaning no please, Idon't want to go back!) Eventually Kit chose a book called 'Dragon Wars'.

"Nice Cover," Kit muttered under her breath. Josh and Alita were elated! They each high-fived each other and went back to reading. Mrs Susan, the librarian, looked relatively relieved and relaxed as well.

"There COULD have been a dragon war here!'' she muttered under her breath.

They each borrowed their books.

"This book IS quite interesting!" mumbled Kit loudly, holding the book inher hands.

Their books lay forgotten on Josh's couch as they all settled in for a video game of Dragon Wars. The next day was a Sunday, which meant the library was open 24/7.They hurried to the library clutching their books to their chests.

"Let's read Dragon Wars together," suggested KitAlita and Josh thought that was a splendid idea, so that's what they did.

"Evil Dragon," whispered Kit reading the book.

KKAAAAAABBBBBBBBLLLLLLOOOOOOOOOEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!

"AARRGH!" screamed Josh in the element of surprise, shock and fear. In their terrifying midst, their stood, what looked a bunch of demons, AND AN EVIL DRAGON!

"OH NO!" Kit screamed at the top of her lungs! "Mrs Susan! Help!"

"Where's the librarian when you need her the most!" Josh wailed.

The trio (the real trio) dashed towards the door, only to see the nightmares following them!

"We definitely can't take them on!" Alita explained, "They' ll pulverize using to smithereens!"

Just then Kit tripped. Ok guys, I know a lot of times you've tripped at the wrong time, like when you are coming first at cross country, then you trip milimeters away from the finish line, then you end up being 38th place. Or whenyou are walking to give a speech, then you trip going to the speaker. I could list millions of wrong times to trip. But the time Kit tripped at is taking bad timing to a whole new level!

Anyway, Kip cried, "You guys go on without me, I started this mess, andnow I'll end it!" She said it like an action hero just about to die.

"Stop being silly, now's not the time!" Josh and Alita screamed, while stopping momentarily.

Just as the dragon spat out drool, AKA, fire, the three found themselves with a game controller in their hands.

"What!" Josh stammered.

"Come down for breakfast guys! Kit's mum shrieked. "Is it me, or did this just all happen?"questioned Kit, looking at hercharred T-shirt.

------ó------

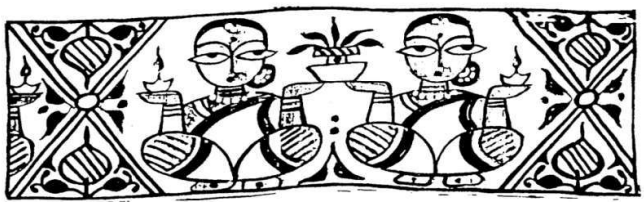

Platypus vs Echidna

- Dibbo Barua, Age: 8

It all started when the Prime Minister of Australia declared that two new animals were moving into the country. The whole animal world was abuzz with the news! Australia was a very sought-after location, with The Great Barrier Reef and Uluru, who wouldn't want to make this their new habitat?

The animals of Australia were also excited. They wondered of what animal they were getting… could it be a gorilla, a cobra, a tiger or an eagle? Meanwhile, the news was spread to New Zealand.

The President made the announcement, it would be the Echidna and Platypus, his two most hated animals. He was happy to get rid of them, he hated the way that they ran away when someone comes towards them. He also doesn't like the constant war against them. Platypus and Echidna were always pulling pranks on each other, both claiming to be the better animal! They hated the way everyone always said they looked the same because of their brown colour! "We're completely different," they would both think to themselves.

The day soon came for their big move, Platypus was excited to finally be rid of Echidna. Finally, no one would be constantly mixing them up or comparing them, believing he was the superior animal. Little did he know that Echidna was also chosen to make the move.

Echidna was so excited to see who would join him in his migration – could it be the piranha, or even the anaconda? "At least it won't be Platypus", he thought to himself, smiling.

Finally, when they arrived, they got to see each other at the airport the complaining began! Platypus was straight on the phone to the Prime Minister. "Why did you choose me? All I wanted to do was get away from Echidna and now you've put us together!" A few seconds later Echidna did the same, "What have you done? Send me back!" Echidna pleaded. "I cannot live with him!" However, the Prime Minister did not change his mind.

Their flight was long, with both of them stewing for hours with rage. An emergency meeting was called upon landing. The animal kingdom had to come up with a way for these two to live together in peace or risk their happy days in the outback into chaos! They decided the

best way was to let the two live together, side by side, for a week with no one else around.

They were placed in a forest with lots of vegetation and a freshwater source.

“Wow,” said Echidna. “They have my favourite plant!” “That’s my favourite too,” said Platypus. “Humph”, they both thought to themselves, “it still doesn’t make us friends”. They ate separately in silence and went to sleep still huffing and puffing.

The next few days flew by still the same way, with them both avoiding each other and grumbling to themselves. By the end of the week, a small group of school students were brought into the forest for an excursion. As they were getting of the bus, one student tripped and began to cry. His classmates ran to him, picked him up and helped him over to the field. “Look, Platypus’s!” they all squealed excitedly, and the bruised knee was soon forgotten.

Echidna’s feelings were hurt, as they did not recognize the difference between him and Platypus. He went to sit under a tree, and then began to cry. He missed his old friends; he missed his old country. Platypus saw this, and went over to Echidna with some of his favourite plants to cheer him up, and then walked away without a sound. Echidna was so surprised of this kind gesture from Platypus.

Meanwhile, the children all rushed to them and immediately began stroking their fur and feeding them juicy plants. They spent the day together, playing with the children, and for the first time actually laughed together!

Later that night, Echidna approached Platypus while he was getting ready to settle in for the night. “Thank you for your kindness today. I am surprised you would care about my feelings, I thought you hated me.” Platypus replied, “I have never hated you. I thought you hated me. We always seemed to be compared one another. But today when I saw the children help their friend, it reminded me that we all need to show kindness to help each other through hard days. So, this is what I have done for you. I can see you are missing your old life.”

Echidna was touched, and it brought a tear to his eye. “You are right, I am sorry for the years of fighting between us. I guess we should have spoken to each other, and we should have realized how our similarities actually make us good friends.”

They both learnt that day, to talk to each other before judging each other, and showing a little bit of kindness can go a long way.

------o------

Reincarnation of Durga

- Audri Paul

I expanded my eyes as lights and colours greeted my eyes. I found myself in a mysterious heavenly place soaked in water, surrounded by 3 strange figures of light. “W-where am I?” I pleadingly asked, “This all feels … strange”.

“Don’t worry dear, we're here to help you…Durga,” One figure replies. “We incarnated you.” Another figure says. Soon my eyes completely sharpened, I could finally see their true form. “What do you want from me?” I questioned.

“We created you for a purpose. That purpose is to stop death and darkness, become the best in the world and save humanity and the three worlds we created” A blue figure with a snake wrapped around his head replied. This particular figure seemed to be the strongest out of all of them. “Ok, but how do I stop darkness growing?” I asked. “You will need to murder the source: Mahishasura.” the other with three heads says as his first head looks directly at me. “But first, you need to know the concepts of death and how to exterminate it.

After decades and decades, I finally learnt the concept of humanity and the concept of death and life and tamed an animal that is greater than any animal in the jungle; The Lion. Then I finally rode myself into battle with every single blessing and weapons from the gods who made me: Shiva, Vishnu and Brahma. “This is the day I defeat the wicked being of Mahishasura,” I proudly said as I looked into the distance and found the devil himself. “Mahishasura! End this now or surrender!” I forcefully shouted and then he took a menacing laugh. “Why would I stop?” He greedily grinned as he turned to the only species he forgave which was the buffalo. He huffed and took a great charge towards me and that's when my animal charged at him to protect me. With a great swipe, he takes down Mahishasura but this angers him. Mahishasura then again takes a big huff and rushes towards my saviour.

I took a huge leap forward in front of My pet and laid my trident forward. This stops Mahishasura. Then, 15 days later, the fight kept going. I had to put an end to this. As Mahishasura changed back to his buffalo form I took my leap and stabbed the trident through his chest which forced him into his true form and ended him. Light shot out from the sky to show my success as the darkness that once enveloped the atmosphere became a myth and peace was restored to the three worlds.

------o------

The story of a poor girl

- **Bela Paul**

There was a girl who lived with her uncle. They were very poor. One night the stars were shining, and the moon was so bright. The little girl saw a shooting star and made a wish. She said, “shooting star, shooting star, make my wish come true.” So she made her wish and her wish was to be rich. She slept begging for more money all night. So one night, a gorgeous little fairy appeared. When the little girl and her uncle was asleep, the gorgeous lovely fairy waved her wand and said “make some money for the little girl.” So morning appeared. The little girl was awake. The little girl said, “can I walk to the village?” “ok,” Said her uncle. So she walked through the village and bumped into a magical witch and said “ Are you poor?” “Yes, I am!” she said, “Who are you?” “I’m a magical witch. Come to my house, at the end of the street.” “Ok? But are you going to do something with me bad?” the little girl asked. “Of Course not darling!” She shouted. “Now, let me click my fingers and we’ll be there.”

So the little girl and the witch was there. “B-b-but how?” the little girl questioned. “What’s with the slimy stuff?.” “Oh, nothing really.” She grins. “Now, I’m going to cast a spell on you through my magical pot to make you rich.” She says. “Ok,” the little girl says. “Then drink up!” the witch laughs as she passes a potion to the little girl. The little girl then drank it all up and felt very unwell. “what is happening?” the little girl shouts as she turns into gold. And that was the end of the little girl.

------O------

The Electrician

-Prithul Bisshay

We were always told tales of the Electrician, the monster that gives energy to the maze by way of human consumption, and I was about to meet him. The maze unfurled in front of me. Corridor after corridor, turn after turn, it was endlessly expanding. I kept running, towards or away from safety I did not know. I was almost out of breath in a long corridor when I heard it. Loud, heavy footsteps underscored by electricity fizzling out. I hugged the wall and cupped my mouth, so my shallow breaths did not alert it. It got closer and as the sterile, almost medicinal lights went out above me, I got a good look at it. The Electrician was tall, large hands and feet, but skin and bones everywhere else. It was covered in machinery, a sheet attached horizontally across its eyes blinding it, with dried tears of blood coming from where the eyes were. The mouth was filled with stained teeth, probably in blood. Its stomach was exposed, a thin membrane kept the stomach acid in, and inside was barely digested limbs. It was a fresh kill. I was paralysed in fear at the fact that not only could I join the arms and legs, but I could’ve known the person there, now food to this electrical nightmare. It approached cautiously, hunching over and listening for any noise. I didn’t breathe despite my lungs screaming for air. My hands were shaking. One wrong move and I was on a one-way-ticket to this thing’s mouth. My eyes darted around at the pale figure, desperately trying to find a way out. And it came, as a loud footstep down the corridor. My thoughts were split between saving them and dying, but I didn’t get a choice. The Electricians’ head did a 180, a gruelling crunch of presumably it’s neck

Quickly followed by its now light footsteps as it darted down the corridor. It reached its target, a scream cut off by the sound of rending flesh and gnawed bones. I refused to breathe. I’m not letting it hear me. Desperate for a way out, I looked towards the sounds of human consumption, filled with fear. Electricity was crackling, but it wasn’t the lights turning on. It was coming out of the machinery on its back, reaching for the ceiling and the walls surrounding the hallway. I slowly let myself tothe floor and collapsed. I woke up, not in my quarters like usual, but instead in front of a missing poster.“Nieve, Missing since 27th of October. If you have any details, please report it to the police at Westerpool PD.

" The poster read. It was obviously old, the wind lapping atit's dirty edges, on the brink of falling off. There was a picture of a person, of me. My thoughts were filled with confusion. Why am I noting the maze? How long has it been since that day? Is this real? They were quickly interrupted by the sounds of crying. I go towards the source of crying and find myself in front of a grave. It was brand new, flowers still strewn about and the soil freshly dug. A funeral happened before I got there, and I look at the headstone.

"Nieve,

loving brother,

husband and father.

May he finally be at rest"

The headstone inscription was short and sweet.

A voice whispered in my ear unintelligible but forbidden words as it brought me from my funeral. The Electrician hung above me, looking menacingly at me. It had eyes. Pure white eyes. It smiled an oh-so crooked smile as it opened it's maw and consumed me. I jolted out of my bed, where the maze sends me when it hits 6 AM in the real world, marked by the freshest blood that I have spilt. This maze works in strange ways. Myfriend from my old work and also my cabin mate wakeup as well, very concerned. "Are you good, Nieve?" He inquired, very concerned "No, actually, Johnny. I barely escaped The Electrician and watched somebody DIE."

I exclaim in a mix of frustration and horror.

"...Oh." He simply responded. Fitting reaction to befair.I told him about the dream as well, wondering if that is actually what happened.

"What did it say to you?" He quizzed about the voice I heard.

"Something bad."Is all I had in response.

"Huh. Maybe you should stay in the compound, we don't want to risk another explorer dying."

"Yeah. Maybe I should."

We both get out of our beds to get ready for the upcoming day, and what a day that would be.

------o------

Caterpillar Cam the Superhero-Starting Out

– Irfan Galib

It was a sunny day at 49 leaf-leaf-leaf road. When the phone rang "Beep Beep" the caterpillar who lived there was NOT happy. it was the third time the phone rang when he was sleeping. He answered the phone with a grunt. "Hello" he said, the phone replied with a robot voice "YOU HAVE GOT THE COP JOB".

Cam the caterpillar was so happy he would miss every bug war game at leaf-leaf-leaf stadium just for that experience. For those who do not know, bug war game is like a giant tournament with obstacles, in the first 5 battles the obstacles will be monkey bars in the next 2 it will be a boxing ring and the quarterfinal semi and grand finale it will be karate.
He left his house and got to work. His first case came quickly! The chief said to find Lance the dragon. Cam ran to find Lance but he was burned from the fire. He was rushed to hospital and came out with 3 broken legs (he only had 6).
He missed 6 months for each to heal. when he got back the chief said to Cam gruffly, find Bert bee this time. It was easy for Cam. Bert lost his sting, so Cam caught him. Chief was sorry for underestimating Cam. Cam was happy!

The next day he woke up at 4 am sharp to start work. His next case was a laser breathing goanna. but this time chief gave him a laser shield so he wouldn't get hurt and could go close to the goanna. He did it easily again.
The next sunrise it was his break day. So, he went to leaf-leaf-leaf stadium and watched a bug war game. It was a close game! Aaron ant vs Inka insect. It was close but Inka edged out Aaron to a corner and Aaron couldn't get to the next bar. So, Inka pulled him down. If only Inka knew what Aaron did next! Aaron held Inka's hand so he would fall off with him. But he lost his grip and Inka took the win!
The next break day he watched Aiden aphid vs Inka for the second round of the bug war champion ships. He was also excited after 4 days, the 3rd round would come, and his brother would battle the winner of this round! This one was so close Aiden was just about to win when

the tickle strategy was used so Aiden aphid lost his grip so Inka won the round.

The next day he was back to work and was told to find Aaron ant the famous bug war star because he had been stealing equipment to make him win! He was surprised but he caught Aaron. It was big and exciting day, just when he was sleeping the phone rang. It was the bug war company they said they wanted Cam to compete in the 4th round!

He told chief and chief said he will make his working week shorter so could have 3 days to play for bug war. But it was also bad news because he would have 3 days to work as a cop, 3 days to play bug war and would only have 1 day free! So, he can't watch the third round at the stadium! Cam was worried how would he manage?

The next day he was so late for work he missed it and he missed his brother play Inka! He was so sad but he watched the replay on his TV. This was epic and sad. Inka started weak and got strong near the end, Cam's brother was cornered and couldn't hold on, so Inka won. The next day, it would be Cam's round!

Then next day Cam woke up really early. He was going to leaf-leaf-leaf stadium for the first time to play bug war! He packed his equipment and got to the stadium. He got a bit early so he was able to get some popcorn to give him energy.

Then "Beep Beep" it was his phone! He checked it and apparently his day off got cancelled. A cargo had been stolen and he was accused of stealing it! He said that it couldn't be him because he was not anywhere near the cargo. But they did not listen as there was a footage of him driving away in the car, towing the cargo behind it. He was taken as a prisoner. Our superhero and bug war contender is now a criminal! What will happen next? Is he the real crime mastermind? (To Be Continued)

------o------

Getting Older

-Joyoti Sarker

One sunny evening there was a fifteen-year-old girl whose name was Sophia. She had a sister, Lily, who was 9 years old. Sophia came down to fill up her water bottle and saw her parents and her sister talking about something.

"Hey, Lily, what are you guys talking about?" asked Sophia.

Her parents were acting very suspicious along with her little sister.

"Nothing!" they said suspiciously in unison.

"You're not talking about my birthday party, are you? I don't want one!" Sophia said.

She left the room and then her parents started talking about her birthday party.

"We should get a pony ride!" smiled Lily

"Good idea, Lily!" beamed her dad.

They were planning a surprise party for Sophia.

The next morning Sophia woke up and she heard cheering and shouting from the window.

"Oh no," she cried.

She got dressed and then she ran out of her door, and everybody shouted surprise. She was very mad at her parents; she told them that she didn't want a party! She didn't want a party because she knew her parents would set up pony rides and baby stuff like that she doesn't like, and they did just that!

She ran away somewhere that nobody would find her. She stayed there for a few hours and just cried. She wished she could have a normal party with her friends, not Lily's friends. Her best friend Cassidy found her and said meet me at the cafe tonight at 7 o'clock. Her best friend knew exactly where she would be because that was where they would talk about private stuff. Sophia was very confused but still went to the cafe.

Sophia's real friends were at the cafe, and she had the best birthday ever. Cassidy planned a whole party just for her. After they partied for a few hours, she went home and told her family why she had run away and where she had been. She was very happy to be home with her family.

"We're sorry Sophia! We just thought you still liked little children's stuff and we forgot that you are already 16!" her dad responded.

Her family was very glad that she told the truth. They sat down down and ate some scrumptious food and from then on everybody was happy.

------o------

My Zoo Expedition

-Sreyoshi Sen, 9 Years

Today we went to the zoo. There were Pertho uncle, Iyan, Iyan's grandpa, Arjun, My dad, and me. First, we went to the reptile enclosure there were snakes, lizards, and tortoise. Uncle thought the tortoise was fake. But Itold him it was real. Next, we saw the penguins, after wesaw the beautiful birds soaring in the sky sitting down onbranches. There were ducks and even a black swan!

Then we went to the Aussie Bush-Walk there were Kangaroos and Wallabies probably more than a dozen. We saw dingoes as well. We then went to the Asian forest we saw a Red Panda, Elephant, lions, giraffes and hegdogs! Did you know there is such as tiger wine? It is made out of tiger bone marrow which is stuff inside your bones. Its demand has increased in Asia, so more tigers are dying. After we saw the Rhinos, they had a large array of them (THE ENCLOSYRE WAS SUPER STINKY!) After we all went to Hungry Jacks because we were starving. We got burgers French fries, coke, and rainbow bursitis.

------o------

Picture By: Srija Sarker

Mummy Disaster

-Rayan Dash, 8 years

Egypt is a country of Pyramids and about one century ago a Mummy was discovered in one of the Egyptian Pyramids. This was the first Mummy in the world to get discovered. On the sarcophagus it says – mummy's name was Mia Haug and it was a Mummy of 1800 AD. The discoverer name was Austin Hedwig and James Hartley. They both tried carrying the sarcophagus, but it was too heavy to move, so they dragged it out of the Pyramid and handed over the Mummy to scientist to study and later handed over this to a museum.

When the scientists were exploring the body of the mummy, one of them found the DNA of the Mummy and then added some fire power to the DNA pot, a special power which brought the Mummy to life.

To bring the Mummy to life, first scientist pour all the DNA collected from the dead body and poured in a pot and then set fire. They have waited and waited and after 3 days, suddenly the body stood up, All the scientists were sacred, and they jumped back in a fright with a loud scream which attracted their Boss and he rush into lab and was surprised to see a walking Mummy inside the room, and it was as slow as a dead body. He even didn't know a Mummy existed and thought this was just a theory but now he can see one is walking Infront of his eyes.

Now they have a problem whether they will let Mummy go free or lock her up and after some thinking and discussion they decided to let her go free.

Now the Mummy didn't have to go back to Museum and since it was set free. But the Mummy created the Havoc as it started walking free on the road, all the babies started screaming and people found difficult to hid. They called the police and another team of scientist put him into death by injecting some medicine.

------o------

How Durga Saved the Gods from Mahishasur

-By Rajshree

Once, a demon called Rambha, prayed to god. God heard his prayers and asked what his wish was. Rambha replied, “I wish that no human, god, plant or precipitation can kill me.”. God said, “Very well, if that is your wish.”. One days, Rambha fell in love with a female bull. She loved him too, but a male bull killed Rambha. The female bull asked why he had died. God replied, “He didn’t say no animal could kill him.” Soon the female bull had a son called Mahishasur. Since he was half bull and half demon, he had superhuman powers. At that time, gods and demons were bitter enemies. Most of the time gods won. By that time Mahishasur had grown up to be a bad-mannered demon. He treated his servants harshly. One day he prayed to Brahma that only a woman could kill him as he was sure that no women would be strong enough to kill him. Soon there was a deadly battle between the gods and the demons. The demons were winning since Mahishasur would only die if a woman killed him, so all the gods gathered together to create a new god. The gods created Durga. They gifted her weapons and powers. She had 10 hands, rode a lion and held a trishul. She went down to Earth had a battle with Mahishasur. Soon she just had to fight him as a bull since Mahishasur took the form of a bull. Durga charged at him and plunged her trishul into his chest. That was the end of Mahishasur. All the gods cheered for Durga as she had saved them all.

------o------

বৈপরীত্যে

-স্বর্ণা আফসার

পূর্বপশ্চিম

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে
আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।

আদর্শলিপি। ছোটবেলার বই, মানুষ, আদর্শ, অনেকটাই বিলুপ্ত প্রায়। এই দূরপরবাসে ছোট বেলার কিছু খুঁজে পাওয়া দুর্লভ । তবু স্কুল ছুটির সময় স্কুল গেটে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগে। খুব হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়া বান্ধবীদের মাঝে, খুব উদাস চোখে তাকিয়ে থাকা মেয়েটির মাঝে কিংবা খুব বুদ্ধিদীপ্ত দুষ্টু ছেলেটির মাঝে আমি ফেলে আসা বন্ধু, দিন, আর শৈশব খুঁজি। আর খুঁজি আমার ছেলেমেয়েদের মাঝে। সকালে সাদা ফিতে দিয়ে চুল বেঁধে, সাদা জুতো পরে, লাইন করে জাতীয় সংগীত গাও। ক্লাস এ মন দিয়ে পড়াশোনা করো। জোরে কথা নেই, হাসাহাসি নেই। শিক্ষক আর শিক্ষিকা পরম শ্রদ্ধার। এদেরও শৈশব আছে। সাদা ফিতের বালাই নেই। জুতো বাহারি হলেও চলবে, চপ্পল হলেও চলবে! কোনো নিয়ম নেই। আর শিক্ষক তিনিতো বন্ধুর মতো। তার সাথে গল্প বলাও চলে, হাসি মজা করাও চলে। আমার ছেলেমেয়েরা যে এতো গুণধর তা তাদের শিক্ষক আর শিক্ষিকাদের সাথে আলাপ না করলে জানতেই পারতা মনা! বাসায়তো গুনের কোনো ছিটেফোঁটাও দেখতে পাইনা। সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে দেখতে পাওয়াই হয়তো শিক্ষকের কাজ।

আমার মেয়ে যখন প্রথম স্কুল যাওয়া শুরু করলো, অবাক হয়ে দেখলাম কোনো কান্না নেই, জড়তা নেই। বড় বড় গাছে ঘেরা একটা স্কুলঘর। কোনো কোনো বাচ্চা আগে মা ছাড়া কারো কাছে থাকেনি। তারাও খুব সুন্দর এক কাতারে খুব তাড়াতাড়ি সবার সাথে মিলে গেলো। স্কুল সবার খুব পছন্দের জায়গা। নিয়ম করে ব্যাগ রাখা, ওখান থেকে গোল একটা কার্পেট এ বসে গল্প বলা, ছবি আঁকা, কাঁচি দিয়ে কাটা কুটি, আর তারপর সবাই মিলে বসে খাওয়া, একসময় লাইন করে খেলতে যাওয়া, দিন শেষ, বাড়ি ফেরা।

হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে যখন নিজের শৈশবে ফিরে যাই তখন একটা ভালো মেয়ে আর একটা ভালো ছেলের ছোট ছাঁচ দেখতে পাই। পড়াশোনায় যে ভালো, বড়দের সম্মান করে, সেই ভালো। বাকিরা শুধু ভালো হওয়ার চেষ্টা করছে। কারো সাথে প্রথম পরিচয় হলে, কোন স্কুলে পড়ো? কোন ক্লাসে? আর রোল কত? রোল যদি কম সংখ্যায় না হয়ে বেশি সংখ্যায় হয় তৎক্ষণাৎ ভবিষ্যতের অন্ধকারবাণী কানে শুনতে পেতেন গুরুজনেরা। মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছে করে রোল এক ছেলে টা

আর মেয়েটা কি সাফল্যের মাল্যবর নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? সবার কি বলবার মতো একটা টাইটেল, অনেকগুলো সাজানো পদক আরপ দবি আছে? সাফল্য বলতে আমরাতো এইটাই বুঝি!

পশ্চিমের স্কুল গুলোতে বাচ্চাদের শৈশবে রোল নম্বর, রেজাল্ট ভালোর কোনো বালাই নেই। কে ফার্স্ট হলো, কে সেকেন্ড, কেউ জানেনা, মাথা ব্যাথাও নেই কারো। সবাই যার যার মতো তারকা। কেউ ভালো গান গায়, কেউ তাকলা গানো ছবি আঁকে, কেউ উসাইন বোল্টের মতো দৌড়ায়। এতেই তাদের পরিচয়। একেকটা বাচ্চার নিজস্বতা বের করে আনা, ওদেরকে নিজেদের মতো করে বিকাশ করতে দেয়া, এটাই স্কুলের লক্ষ্য। কেউ ভালো ছেলে বা মেয়ের ছাঁচে কাটানা।

আমার সব থেকে ভালো লাগে এদের স্কুলে বাধ্যতামূলক ভাবে সংগীত আর ছবি আকার চর্চা হয়। এই বিষয় দুটো বাচ্চাদের খুব পছন্দের। কেউ কেউ সকালে ঘুমের অঘোর ঘোর কাটিয়ে স্কুলের choir যায়। স্কুলের choir থেকে শহরের সবথেকে বড়ো হলে সবাইকে গান শোনাবার সুযোগ পায়। শিশুদের ছোটবেলাতে ওরা মানুষের সাথে মিশতে পারা, শিক্ষা গ্রহণের প্রতি আগ্রহ তৈরিতে জোর দেয়। আর জোর দেয় সকলের সাথে মাইল কাজ করতে পাড়াতে। দশে মিলে করি কাজ, হারিজিতি নাহি লাজ। আমরা বইতে পড়ি ঠিকই, কিন্তু দশে মিলে কি আসলেই কাজ করি? দশের মধ্যে সবাই মনে মনে অন্য সবার থেকে ভালো হতে চায়। প্রতিযোগিতা আর তার উল্টোপিঠে সহযোগিতা। প্রতিযোগিতায় একজন এগিয়ে যাবে হয়তো। কিন্তু সত্যিকারের বিজয়ী হতে হলে দরকার সহযোগিতার।

পশ্চিমে স্কুলগুলোতে পড়াশোনার সাথে সাথে মূল্যবোধের উপরে জোর দেয়া হয়। পড়ার বইতে যাসব গল্প আর কাহিনী থাকতো, মনোরঞ্জন কিংবা শিশুদের চিত্তা কর্ষণের থেকে শিক্ষামূলক গল্পের উপরে জোর দেয়া হতো। সততা, সময় অনুবর্তীতা, পরিশ্রম, নিষ্ঠা সব বিষয়ে রচনা লেখা, বড় বড় ব্যাখ্যা লেখার ফাঁকে ফাঁকে কেউ যদি সত্যিকারের মানার চেষ্টা করে থাকেন, তাহলে আসলে জীবনে ভালো মানুষ হতে পারা যায়। অবাক লাগে যখন দেশ ভরা দুর্নীতি দেখি। তাহলে মুখস্থ বিদ্যার মতো বেশি বেশি নম্বর তোলার জন্য সবাই পাতার পর পাতা লিখে এসেছে শুধু, মন দিয়ে কিছুই অনুধাবন করেননি!

আর ভাবি সেই সব তুখোড় ছেলে মেয়েদের কথা। মানসাঙ্ক করতো যারা বিদ্যুতের বেগে। যারা এক মিনিটে এঁকে ফেলতো বাংলাদেশের মানচিত্র সুনিপুন ভাবে। যাদের ভূগোলের জ্ঞান এখান কার যেকোনো কুইজ শো বিজয়ীকে লজ্জায় ফেলে দেবে। যার কবিতা যেকোনো পরিবেশে মনকে ছুঁয়ে যাবে। যার রচনা আর সুভাষণ সারাদিন শুনলেও মন ভরেনা। যার গান স্কুলের সব অনুষ্ঠানে থাকতোই সূচনা তে। কোথায় হারিয়ে গেলো সেই সোনালী বিকেল গুলো? স্বপ্নের দিনগুলো? আমি ভাবি তাদের কথা, অতীত আর বর্তমানের কথা। সংসারের ঘানি টানতে টানতে হারিয়ে যাওয়া মেধাবী মেয়ে গুলোর কথা। টাকার পিছনে ছুটতে ছুটতে নিজেকে হারিয়ে ফেলা ছেলেদের কথা।

আর ভাবি দেশের উন্নতি কিসে? যে যেই কাজে ভালো, তাকে সেই কাজ করতে দেয়া আর তার পথের অন্তরায় দূর করার মাঝেই দেশের সাফল্য। দেশের জন্য যেমন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার দরকার, তেমন ভালো শিল্পী, ভালো খেলোয়াড়। সতেরো কোটি মানুষের দেশে একটি সোনার ছেলে কিংবা মেয়ে কি নেই যে আমাদের অলিম্পিক্স এ স্বর্ণ এনে দেবে? নিশ্চই আছে, প্রতিভার বিকাশ আর লালন সেজন্য দরকার। আর দরকার অযাচিত প্রশাসন দূর করা।

এখনকার বাংলাদেশে ছোটছোট বাচ্চাদের কাঁধে বড়বড় বইয়ের বোঝা দেখি, ওদের মাথার উপর বিস্তর চাপ দেখি, খেলো য়াড় ছেলেটার বলের জন্য উচাটন মন দেখি, গায়িকা মেয়েটার সুরের জন্য আকুলতা দেখি আর ভাবি, আহারে খাঁচার পাখি। শৈশব বড়ই অমূল্য। কয়েকদিনের ফুটে থাকা সুন্দর ফুলের মতো। হাসি আর গানে বয়ে যাকনা বেলা। বাকি পুরো জীবনতো আছেই, এগিয়ে যাবার জন্য জীবনের যাঁতাকলে।

উত্তর দক্ষিণ

আমার কাছে এই পৃথিবীর অনেক জানা রহস্য অজানা রহস্যের মতো মনে হয়, আগুন্তুকের ওই উদাহরণের মতো। চাঁদের থেকে পৃথিবী অনেক গুন বড়, পৃথিবীর থেকে সূর্য আরো অনেক গুন বড়। কিন্তু গ্রহণের সময় সব কেমন একই মাপে বসে যায়! চাকতি, চাকতি। তেমন এই উত্তর আর দক্ষিণ গোলার্ধ। উত্তরের দিক নির্দশক ধ্রুবতারা। দক্ষিণ গোলার্ধে সাদার্ন ক্রস। আমাদের একই পৃথিবীতে একই সময়ে কোথাও শীততো কোথাও গ্রীষ্ম। জানি এর রহস্য মানুষের জানা। তারপরেও আজকে বিমানে চড়ে কালকেই চলে যাওয়া যাবে একদম ওপর মেরুর বিপরীতে প্রকৃতিতে!

যদিও করোনা কালে কোথাও যাওয়া হচ্ছেনা। তবে ভাবতেতো মানা নেই। আর মানা নেই মুঠোফোনের পাতা উল্টে পুরো বিশ্বের খবর রাখা। পাতা উল্টে গেলাম জাপানে, কিংবা নেদারল্যান্ডস, বন্ধুরা যে যেখানে আছে, ঠিক মুঠোয় বন্দি হয়ে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দরুন আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, হারিয়ে যাওয়া বন্ধু সবার ছুটির দিন কি কাজের দিনের খবরও। কেউ কেউ দারুন সেলফি তোলে। উত্তর কি দক্ষিণ। সব গোলার্ধেই সেলফির চল আছে। আর আছে সাজানো গোছানো একটা চিত্র তুলে ধরার চল। মেহমান আসলে যেমন ড্রয়িং রুম গোছানো থাকে, আর অন্য ঘর যেমন তেমন, ঠিক সেরকম। যেদিন খুব মন খারাপ, সেদিন কি মানুষ সবাই মন খুলে বলে আজকে খুব কান্না পাচ্ছে? বলেনা। বরং হাসি হাসি মুখের ছবি দিয়ে এনজয়িং লাইফ! আহারে জীবন। এমন মন ভোলানো ছবি দেখে আমরা হয়তো খোঁজ নিতেই ভুলে যাই আসলে কে কেমন আছে?

সামাজিক মাধ্যমে অসামাজিক কাজ কর্ম কম হয় না। আর এর শিকার সবার আগে হয় কোমল মতি কিশোরেরা। জন্মদিনের উপহার হিসাবে পাওয়া মুঠোফোন কখন গ্রাস করে নেয় মুঠোয় কেউ জানতেও পারেনা। হাসি খুশি কিশোরী হটাৎ বিমর্ষ। কিংবা কিশোর হতাশাগ্রস্ত। স্কুল কলেজে কেউ bullied বা এক্সক্লুডেডহলে সেই যন্ত্রনা থেকে বাড়িতে ফিরে স্বস্তি পাওয়া যায়। কিন্তু মুঠোফোনের যন্ত্রনা সার্বক্ষণিক। সকালের নাস্তার টেবিল থেকে শুরু করে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত।

কিশোরদের মনস্তত্ব অপরিপক্ক। ওদের মগজ পুনরায় নতুন করে গঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে ইন্টারনেটে bullied হলে সেই যন্ত্রনা পারিনা সইতে, না পারি কইতে। সন্তানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও হয়তো তারা খুলে বলতে পারেনা সবধরণের সমস্যাগুলো। মুঠোফোনের সুবিধার শেষ নেই. দেরি হচ্ছে, বলে দেয়া যায়। কোনো পরিকল্পনা বদলে গেছে, সাথে সাথে সবাই কে জানানো যায়। কিন্তু কিশোরদের হাতে মুঠো ফোন তুলে দেয়ার আগে, তাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা উচিত কি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাই, কি ক্ষেত্রে যায় না। আমাদের পরিচিত একটি মহলে কিশোর বেড়াতে এসে wifi পাসওয়ার্ড নিয়ে, ৪০০ ডলারের উপর গেম খেলে খরচ করেছে, যেটা আপ্যায়ন কারীর জন্য খুবই অস্বস্তিকর একটি ব্যাপার ছিল। কিশোরদের সাথে বুলয়িং এবং এক্সক্লুশন নিয়ে আলাপ করা উচিত খোলামেলা ভাবে আর বলা উচিত কখন বড়দের সাহায্য নিতে হবে।

এই কাহিনী উত্তর আর দক্ষিণ সব দেশেই প্রযোজ্য। আর প্রযোজ্য হলো নরনারীর সমতা। চাকরির বেতন থেকে শুরু করে ঘরের কাজের সময় সব খানে মেয়েরা পিছি

য়ে আছে. জরিপে দেখা গেছে বিশ্বের সব থেকে সময়ের দেশ সুইডেন। যেখানে ছেলেরা আর মেয়েরা যথাক্রমে ১.৫ ঘন্টাআর ১.৬ .

------o------

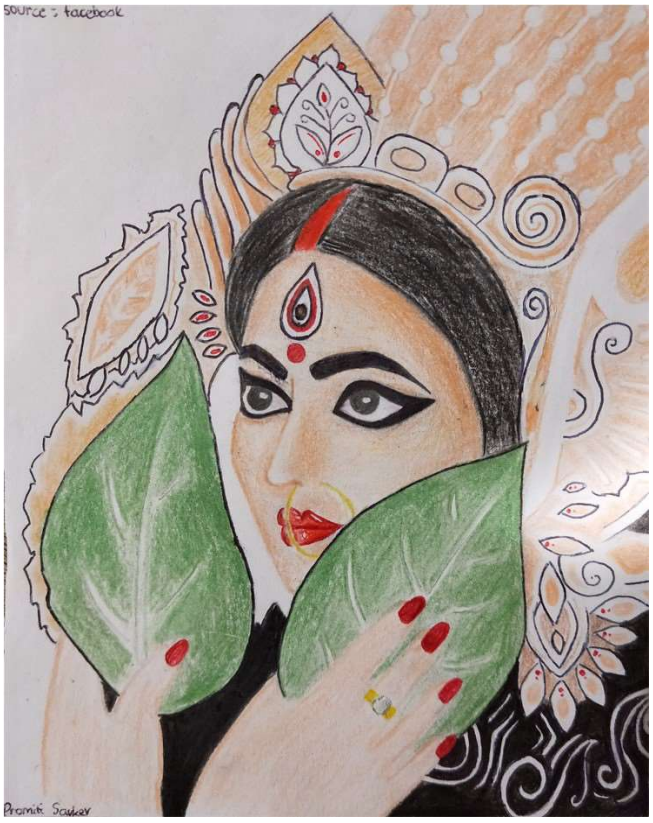

Drawing By: Promiti Sarker

অতি-পাণ্ডিত্যের দৌরাত্ম্য প্রমাণিত

-আজিজ ইসলাম

বন্ধন ২০২০ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার রচনায় সন্দেহ করা অতি-পাণ্ডিত্য সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা দাবি করি যে "নয়ন ভরা জলগো তোমার আঁচল ভরা ফুল" নজরুল গীতিটির মূল রচনায় "ফুল যদি নিই তোমার হাতে / জল রবে না নয়ন-পাতে„ ভাষ্য কোন অতি-পণ্ডিত "সংশোধন" করে "জল রবে গো নয়ন –পাতে " করেছে। মূল ভাষ্যে অনেক শিল্পীর গাওয়া এগানটি আমরা পেয়েছি। এত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তা আমাদের গোচরে না আসার কারণটি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

গানটির "সংশোধিত„ ভাষ্য যা শুনে আমার কানে খটকা লাগে, সেটা ছিল শ্যামল মিত্রের গাওয়া। আমার মনে পড়লো, YouTube-পূর্বকালে এইগানটিই আমি কোন ওয়েব সাইট থেকে কপি করেছিলাম, সেটি ছিল মূল ভাষ্যে গাওয়া। খুঁজে গানটি পেলাম। তখন গানটির দুই ভাষ্য Window Media Playerএ পাশাপাশি রেখে শুনলাম, এবং আশ্বস্ত হলাম যে "সংশোধনের„ অকাট্য প্রমাণ এখন আমার হস্তগত, কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা। কিন্তু দ্বিতীয় বার শুনে যেন আমর মাথায় বজ্রপাত হল, দুটি রেকর্ডই তখন "সংশোধিত„ ভাষ্য হয়ে গেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি বিদ্যায় আমি অজ্ঞান। আমি মনে করলাম এটা কৃত্রিম বুদ্ধির দৌরাত্ম্য। এদৌরাত্ম্যের হাত থেকে মুক্তির পথ না দেখে মনে করলাম যে কৃত্রিম বুদ্ধির উপর ভিত্তি করে আর "অকাট্য„ প্রমাণ দাবী করা যাবে না। সেটাও অনেকদিনের ঘটনা। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে স্মৃতিহ্রাসের সম্ভাবনা নাকচ করতে চাইনি।

এজন্যই আমার রচনার উপসংহারে আমি পুরাতন ভাইনিল রেকর্ডও ক্যাসেট টেপরেকর্ডে মূলভাষ্যে গাওয়া গান সন্ধান করার কথা লিখি এবং ডিজিটাল রেকর্ড, সিডিও YouTube এর উল্লেখ এড়িয়ে যাই। বন্ধনে প্রকাশিত রচনাটি আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি, নজরুল একাডেমি ও ছায়ানটে তাঁদের মন্তব্য প্রত্যাশা করে পাঠাই। নজরুল একাডেমি জানায়, এটা অতি-পণ্ডিতের গণতান্ত্রিক অধিকার। আমাদের জাতীয় কবির রচনার অনধিকার "সংশোধন" করার ধৃষ্টতা গণতান্ত্রিক অধিকার? সাহিত্যের শিল্প-সৌকর্য, শৈল্পিক মান, কল্পমূর্তির যাথার্থ্য, এ-সবের পর্যালোচনা গণতান্ত্রিক অধিকারের বিষয় নয়, সাহিত্যিক-কাব্যিক মান মূল্যায়নের বিষয়।

সুধীমণ্ডলীর স্মরণ থাকতে পারে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ঢাকার এক রিকশা চালক তার যাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে গণতন্ত্রের পাঠ দেয়ার চেষ্টা করলে এক অখ্যাতির সৃষ্টি হয়। পরে সেটা চায়ের আড্ডায় তরুণ-তরুণীদের রসিকতার রসাল গল্পে পরিণত হয়। স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পর গণতন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণার উন্নতি প্রত্যাশিত ছিল, বরং এক রিকশা চালক এবং জাতীয় কবির স্মৃতি-সম্মান-মর্যাদা রক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তির ধারণায় পার্থক্যের অভাব অবনতির প্রমাণ, এক অনপনেয় কলঙ্ক এবং লজ্জাকর বিষয়।

অন্য সংস্থাগুলি থেকে প্রত্যুত্তর আসেনি, আমরা তাঁদের মৌনতা সম্মতি লক্ষণ মনে করতে পারি কি?

কিন্তু এক সাহিত্য –রসিক আমাদের সংশয়ের অবসান করেন, অপ্রত্যাশিত ভাবে। ঢাকা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হাসিনা বানু স্বতঃস্ফূর্তভাবে YouTube এ সন্ধান করে আমাকে জানান যে সেখানে ধৃত এ গানটি অধিকাংশ শিল্পীই মূলভাষ্যে গেয়েছেন। সন্ধান করে দেখলাম যে মূলভাষ্যে গাওয়া গানগুলি অতিসম্প্রতি YouTube এ ধৃত হয়েছে। শিল্পীদের নামও তাঁদের মূলভাষ্যে গাওয়া গানের URL নিচে সংযোজিত হলো।

১৯৪৪ সালে সত্য চৌধুরীর গাওয়া গানটির প্রথম রেকর্ড পাওয়া যাবে তা ছিল আমাদের স্বপ্নেরও অতীত। উর্দূ ভাষী বঙ্গবধূ নাহিদ নিয়াজী স্বামী মোসলেহউদ্দিনের সঙ্গ ওসহযোগীতায় ১৯৯০ দশকের শেষদিকে গানটি রেকর্ড করেছেন মূলভাষ্যে। "সংশোধনের" চল্লিশোর্ধ বৎসর পর এটা তাঁদের অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। আমাদের ধারণা, তাঁরা "সংশোধন" প্রত্যাখ্যান করে অকারণ নিষ্প্রয়োজন অকর্মের প্রতিবাদ করেছেন। https://www.youtube.com/watch?v=MsHfBSJ6rJ4দেখুন । গানটি ২০১২ সালে, এবং সংযোজনের অন্যান্য ভিডিওগুলি ২০১২ থেকে ২০১৯ সময়কালে YoyTube এ ধৃত হয়েছে। ভিডিওর ফটোতে অর্ধাধিক শিল্পীরা তরুণ বয়সের, এর ব্যাখ্যা দ্বিবিধ হতে পারেঃ ১) শিল্পীর তরুণ বয়সে গানটি রেকর্ড করা হয়েছে, কিন্তু YoyTube এধৃত হয়েছেএ -শতাব্দীতে, যেমন সত্য চৌধুরীর আদি রেকর্ড ধৃত হয়েছে ২০১৬সালে। এই ব্যখ্যা প্রমাণ করে যে এই ভাষ্যই গানটির মূলভাষ্য।

২) গানটি এ-শতাব্দীতেই রেকর্ড করা এবং YoyTube এ ধৃত হয়েছে। এ-ব্যাখ্যা প্রমাণ করে যে অতি-পণ্ডিতের সংশোধন এই সব তরুণ শিল্পীরা প্রত্যাখ্যান করেছেন। বয়স্ক শিল্পীরা যথার্থই মূলভাষ্য গ্রহণ করা শ্রেয় বিবেচনা করেছেন।সব রেকর্ডিং এর কাল নির্ণয় সম্ভব, কিন্তু সময় সাপেক্ষ এবং আবশ্যিক নয়।

বাংলা একাডেমীর ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত নজরুল রচনাবলীর নূতন সংস্করণের মুখবন্ধে বলা হয়েছে, "আমরা মুদ্রিত গানের পাঠ অনুসরণ করেছি, রেকর্ডে ধারণকৃত বা স্বরলিপিতে বিধৃত গানের পাঠে ভেদ থাকলে তা নির্দেশ করা হয়নি।" এর অর্থ, তাঁরা "সংশোধন" লক্ষ্য করেছেন এবং উপেক্ষা করেছেন, কিন্তু উপেক্ষা করার কারণ উল্লেখ করেননি। উপেক্ষা না করলে বা তার কারণ উল্লেখ করলে তাঁরা ভাল করতেন।স্বরলিপির পাঠ কি "মুদ্রিত পাঠ" নয়? রচনাবলীর "মুদ্রিত পাঠ" কবির বাকশক্তি হারানোর দশবছর পর মুদ্রিত হয়, বুলবুল দ্বিতীয় খণ্ডে, ১৯৫২ সালে। "সংশোধকের" পরিচয় অজ্ঞাত।এর পূর্বে কবির "মূল" পাঠ স্বরলিপিও রেকর্ডেই বিধৃত ছিল। কোন কারণ না দেখিয়ে এই লিখিত ও চাক্ষুস সত্য উপেক্ষা করার যাথার্থ্য নির্ণয় আমাদের অসাধ্য। আমাদের বর্ণিত শিল্পীদের "প্রতিবাদ" বাংলা সাহিত্যের রথী-মহারথীদের জন্য লজ্জার বিষয়। এই ভাষার মর্যাদার ক্ষার জন্য আমরা রক্ত দান করেছি।এই শিল্পীরা বাংলা একাডেমিকে বাংলা (কাব্য) সাহিত্যের মর্যাদা রক্ষার নজির দেখালেন।

চার খণ্ড রচনাবলীর শেষ দুই খণ্ডে কবির অসুস্থাবস্থায় তাঁর অপ্রকাশিত রচনা যা ১৯৪৫ সাল থেকে প্রকাশিত হয় সেগুলি সঙ্কলিত হয়। এগুলির অধিকাংশ গ্রন্থের প্রকাশক ব্যক্তিরও সংস্থার নামোল্লেখ আছে। যে স্বল্প কয়টির প্রকাশিকা প্রমীলা নজরুল ইসলাম, সেখানে প্রকাশনা সংস্থার নাম নেই, অর্থাৎ এগুলি পারিবারিক প্রকাশনা। ১৯৩৯ সালে কবি স্ত্রী গুরুতর অসুখে কোমর হতে সমগ্র নিম্নাঙ্গে পক্ষাঘাত গ্রস্ত হন। সুতরাং প্রকাশনায় তাঁর পক্ষে কোন সক্রিয় ভূমিকা পালন সম্ভব ছিলনা। প্রকাশিকা হিসাবে তাঁর নমোল্লেখ তাঁর স্বত্বাধিকারীতার প্রমাণ মাত্র। এ জন্য নামহীন প্রকাশনার প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিকেই আমরা "অতি-পাণ্ডিত্যের" অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারি।

বুলবুল দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের কাল ১৯৫২ সালে কবিকে সস্ত্রীক রাঁচি মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, সেখানে তাঁরা চার বছর থাকেন। তাঁদের পুত্র সব্যসাচীও অনিরুদ্ধ ১৯৫২ সালে বিশোর্ধ বয়সের তরুণ, বুলবুল দ্বিতীয় খণ্ড সঙ্কলনে তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা পালন অতি স্বাভাবিক।

সংযোজন – YouTube এ মূল ভাষ্যে গাওয়া গানও তার URL :

১।সত্য চৌধুরী NAYAN BHARA JOL GO TOMAR (1944) - Nazrul Sangeet - YouTube
২।ফিরোজা বেগম | Nazrul Geeti | NayanBhora Jal Go Tomar | - YouTube
৩।অনূপ ঘোষাল NayanBhara Jal Go Tomar - YouTube
৪।ফেরদৌস আরা Nazrul Songs by Ferdous Ara | iav - YouTube
৫।আসাফুদ্দৌলাহ Noyon bhara jol go tomar - Asafuddowlah - YouTube
৬।নাহিদ নিয়াজী Nahid Niazi Sings Noyon Bhora by Nazrul Islam - YouTube
৭।শাফিন আহমেদ Nazrul song by Shafin Ahmed - Noyon Bhora Jol - YouTube
৮।নয়ন ভরা জল – খায়রুল আনাম শাকিল Noyon bhora jol - YouTube
৯।সুস্মিতা আনিস NayanBhora Jol go Tumar - YouTube
১০।নাশিদ কামাল ওয়াইজ NayanBhora Jal Go Tomar - YouTube
১১।বিজন মিস্ত্রি noon vora jol go tomar Nazrul sangeet - YouTube
১২।জলিদাশ নয়ন ভরা জল গো তোমার | Jolly Das | জলিদাশ - YouTube
১৩।আনিসুর রহমান সিনহা Noyon Bhora Jol Go - YouTube
১৪।দেবাশীষ বেপারী নয়ন ভরা জল গো তোমার - YouTube
১৫।তাসফিয়া ফারাহ নয়ন ভরা জল গো তোমার YouTube
১৬।মনসুর ফকির নয়ন ভরা জল গো তোমার আচল ভরা ফুল - YouTube
১৭।স্বপন নয়ন ভরা জল গো তোমার |- YouTube
১৮।মালিহা চৌধুরী আঁচল Noyon Vora Jol - YouTube
১৯।অর্চনা সিংহ রায় Noyon vora jol | Archana Singha Roy - YouTube
২০।জাকির হোসেন Noyon Vora Jol Tabla by Holi Iftekhar - YouTube
নিচের গান দুটি কপি করা হয়েছিল কিন্তু এর ভিডিও আর লভ্য নয়ঃ
ছন্দা চক্রবর্তী নয়ন ভরা জল গো তোমার _ নজরুলসঙ্গীত - YouTube
খন্দকার জগলুল হক রাণা NOYON BHORA JOL GO TOMAR - YouTube

------ó------

ঝালমুড়ি, প্রেমিকযুগল, ভাঙাসিঁড়ি ও আমি

- অনুরাধা মুখোপ্যাধ্যায়

প্রচন্ড ছুটোছুটি করে দেড় ঘন্টার শপিং কি করে যেন একঘন্টায় সেরে ফেললাম । অথচ এই সময়টার জন্য কর্তার সঙ্গে অনেক ঝামেলা করেছিলাম যে কারণে ও আমাকে শপিং মল এ ড্রপ করে নির্দিষ্ট সময় এসে তুলে নেবে বলে নিজের কাজে চলে যায়। খুব ভালো কথা, খাঁচার বিহঙ্গ ছাড়া পেলো বা বলা যায় বাঁধা গরু ছাড়া পেলাম। আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে.....আমি আর আমি.....চারদিক থৈথৈ (তাই বা বলি কি করে).....মোদী বাবা জীবন যে পকেট মেরে রেখেছে! অন্তত তানার দৌলতে এবার দ্যাশে গিয়ে বেশ ফাঁকা ফাঁকা ধুধু গড়ের মাঠের মতো দোকান পাঠ দেখবার সৌভাগ্য হলো .....হেহে জয় বাবা মোদী!

যাই হোক, হাঁ চোড়পাচর করে লিস্ট দেখে কিছু কিনে কেটে সন্ধের মুখে মুখে দেখি বড্ডো তাড়াহুড়ো হয়ে গেছে। কর্তা জ্যাম এ আটকে অগত্যা পেপার কাপ এ কফি । ও বাবা এখনো অনেক সময়! ঠ্যাং দুটো জবাব দেবে দেবে করছে .....অগত্যা গুটিগুটি মল এর সামনে সিঁড়ির দিকে এগোলাম। মধুসূদন মঞ্চের সিঁড়ি দেখলাম আমার যৌবনের রবীন্দ্র সরোবরের বেঞ্চির রূপ নিয়েছে .....আহা কি উত্তরণ!

দুহাত ভর্তি ব্যাগ .....অনেক কসরত করে হাঁসফাঁস করে কোনো রকমে ব্যাগের বোঝা নিয়ে, ব কচ্ছপের মতো কোমর টাকে বেঁকিয়ে নিজেকে সিঁড়ির বুকে ছেড়ে দিলাম।

খানিকটা ধাতস্ত হয়ে ইদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি.....উরে বাবা.....ই কোথায় এলামরে বাবা! চারিদিক এ নবীন, প্রবীণ প্রেমিক প্রেমিকার যুগল, আর মধ্যে কাকতাড়ুয়া বেচারা এই আমি! সেরেছে মার না খাই! ইস্ট নাম ভুলে যাই আর কি!

বুকের দামামা একটু কমতে শুনি মান্না বাবু সবাইকে গান শুনাচ্ছেন। হয়তো তোমারি জন্য হয়েছি প্রেমে যে.....আই ব্যাস .....এলিয়ে পড়লাম, ভাবলাম হতচ্ছাড়া জ্যাম থেকে রেহাই পেলো?

সবে পিঠটা একটু পিছনে এলিয়েছি, উফফ কেঠো হাঁটুর খোঁচায় আবার সোজা! আড় চোখে দেখি প্রবীণ প্রবীণা। যাকযে, মরুক যে, যা খুশি করুক যে, চোখ বন্ধ করে গান শুনি.....এক হাতে শক্ত করে মোবাইল(যদি সময়ের আগে কেষ্টর বাঁশি বাজে).....আর দুবগল আর হাঁটুর ফাঁকে আমার শপিং.....বেচারা বিদেশ ফেরত আমাকে দেখলে ক্যানিং লাইনের চালের মাসি বলাই যেত।

ইতিমধ্যে শুনি মান্না বাবু জনৈক নন্দিনী দেবী কে নিয়ে ঝোলাঝুলি করছেন .....ভালো কথা.....রিলাক্স হবার চেষ্টা করতেই .....কোমরের হাড্ডি আর ইঁটের সিঁড়িতে জোর গোলমাল শুরু হলো.....বাবাগো!

হঠাৎ শুনি...প্রবীণা বলছেন ....'এই...ঝাল মুড়ি কেনোনা'। আমার কান খাঁড়া.....উত্তর এলো 'খুচরো অতো নেই....চাখাও'..... বুঝলাম এ দুটো স্বামী স্ত্রী, প্রেমিক প্রেমিকা কক্ষনো নয়।

ইতিমধ্যে শুরু হলো....'আমার ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে '.....আরে নিকুচি করেছে বলে ফোনটা দেখতেই ওহো একি মিষ্ট মধুর সুর প্রবেশিলো কর্ণকুহরে মান্না বাবুর প্রেম নিবেদন কে ছাপিয়ে? এ যে আমার কেষ্টর বাঁশি.....'এসে গেছি , বেরিয়ে এস'

রাধা ও বোধ হয় এমন বেগে উঠবার চেষ্টা করেনি.... কি বিপদ! প্রাণ বলে যাবো যাবো.....ঠ্যাং বলে নড়িবনা....ঝিঝি ধরেছে! কিজ্বালা! কেষ্ট হতচ্ছাড়া বাঁশি বাজিয়েই চলেছে..... মোলো যা!

এই টানা পোড়েনে হটাৎ একটি কণ্ঠ যুগল পিছন থেকে বললো..... ঠেলব? আমি তখন আরো সুস্মিত হেসে পাচন গেলা মুখে বললাম..... yes প্লিজ।

তারপর? একদম হেইও স্টাইল এ আলতো ধাক্কা আর আমি দুই হাত ছড়িয়ে ব্যাগদের ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়ালাম.... এই মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে জয় মাতারা বলে..... প্রায় উড়তে উড়তে এই প্রেমিকার ওড়না আর কারো পা মাড়িয়ে একলা ফেরাস্তায়! কোনোরকমে গাড়ির ভিতর মাল পত্র শুধু নিজেকে সপে দিয়া শুনি মান্না বাবু গাইছেন..... 'অভিমানে চলে যেয়ো না'.....

------o------

TAX Returns
Company Audits
GST/BAS Preparation
building wealth for you
CPA
ABS is a CPA Practice
Special deal 4 new clients
Call for a quote
08 9470 3560
Morshed Hasan CPA
ATLAS BUSINESS SOLUTIONS
Auditors & Accountants Australia
461 Albany Hwy, Victoria Park, WA- 6100.
PO BOX 26, PARKWOOD, WA 6147
Tel: 08 9470 3560 (W), Mob: 0474 154 695
E-mail: h.morshedul@atlasbusiness.com.au
www.atlasbusiness.com.au
We are offering you first consultation free, 10% discount for new clients, best quality services*
We are providing you personalised services.
Once you become our client you will get free consultation for future*.
We are providing advices to grow your business as well as your wealth.
*Conditions apply
Our Services:
Tax Returns for
> Company, Trust, Partnership, Personal
> Self managed superfund
> Rental Property tax
GST/BAS Preparation
> Bookkeeping/Payroll
> Formation of Trust/Company/SMSF
> Tax advice/Tax strategy to minimise tax liabilities
> Business consultation/advice
> Superannuation strategy to save tax
Auditing & Assurance
> External & internal audits
> Public company and other company audits
> Not for profit organisation audits
> Charities and incorporated association audits
> Real estate & settlement agent trust account audit
> Motor vehicle dealers trust account audits
> Strata title and outgoings audits
> Franchise audits
> Schools and Universities accounts/funds audit
> Self managed superfund audit
Find a suitable business structure that suite you
Investment property consultation
Business Tax Planning
Financial Accounting and reporting
Fringe Benefit Tax (FBT) calculation
Our experienced team members are highly dedicated for client and having more than 10 years work experience in accounting industry.
We use advanced tools & techniques to minimise tax liabilities
Special Offers for New Clients

WORLD OF
CHILDREN

BANGALI SOCIETY FOR PUJA CULTURE PERTH

ANANYNA, ALINA
AARON, DIBBO
BISSHAY
NIMISHA
MOHOR
SRIJA
USHNO
ADRI, ARUNIMA
BELLA
GOURAB, JOYOTI
RIANA
PROMITI
AUDRITA
WORLD OF
CHILDREN
LETS START
GIVING
WE ARE THE
WORLD
WE ARE THE

Indoor Flooring

Artificial Lawn & Landscaping

Outdoor Decking

Paving

Planter Box

WATTLE FLOORING
Unit 2 , 48 Vinnicombe Drive
0481518111
www.wattleflooring.com.au

Wattle Flooring & Outdoor Living

15 % Discount for All Bangladeshi Customer

Paul Tax & Accounting Services

Individual Tax Return from ***$50***

> Rental Property Tax Return

> Company, Partnership, Trust and SMSF Tax Return

> Company, Trust and SMSF set up

> Tax Planning > Small Business Setup

> GST Return > Bookkeeping Services

Contact: 0433003415

Biplab Paul
Paul Tax and Accounting Services
Registered Tax Agent and Public Accountant
Masters of Accounting (Central Queensland University)
M.Com (DU) B.Com (Hons) DU
Email: paul_biplab7@yahoo.com.au

Blue River Financial Services Pty Ltd

Wahid Khan
Master of e-business
Senior Financial Planner/Director

Raj Joarder
Master of Mechanical Engineering
Financial planner/Director
Debt Advice Specialist

We work with our clients to assist in:

1. Establishing **Home Loans** with access to a range of providers
2. Building **Superannuation** assets
3. Mortgage & Family **Protection**
4. Creating a **Retirement Plan** tailored to their goals and objectives
5. Creating wealth through **Investment Planning**

MOB: 040 3979 106 & 0433 221 832

Web : http://www.blueriverfinancial.com.au

Blue River Financial Services Pty Ltd ABN 18146890128 and Wahid Khan are Corporate Authorised Representatives Of AFG and Respect| Australian Financial Services Licence 232706 | Australian Credit Licence 232706

Express yourself with...

Ananyna's COLLECTION

- Sarees
- Salwar Suits
- Kurtis
- Palazzos
- Men's Panjabi
- Jewelry
- Kidswear

View only by Appointment.

CONTACT - Anu 0413161491

LOCATION - 9/88 Broadway
Nedlands 6009